কমিউনিটি স্বাস্থ্য শিক্ষা

ভূমিকা:

বাংলাদেশ একটি স্বল্প উন্নত জনবহুল দেশ। এর প্রায় ৭১% জনগন গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে এবং প্রায় ৪০% জনগন শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। যেখানে অধিকাংশ জনগন গ্রামাঞ্চলে বাস করে তার বিপরীতে অধিকাংশ প্রশিক্ষিত চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্য কর্মী শহরাঞ্চলে বসবাস করে, ফলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় একটি অসম অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। অপরদিকে দারিদ্র, অপুষ্টি, অবহেলা, শিক্ষায় অনগ্রসারতা ইত্যাদির কারনে জীবন যাপনের মান দিন দিন কমে যাচ্ছে। তাই জীবন যাপনের মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ করে স্বাস্থ্য শিক্ষার মান উন্নয়নে বিকল্প কোন ব্যবস্থা নেই।

অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশের রোগসমূহ বিশেষ করে ১. সংক্রামক ব্যাধি - ডায়রিয়া, টাইফয়েড, যক্ষা, টিটেনাস, হুপিংকাফ, হাম, ম্যালেরিয়া, কৃমি, চিকেন পক্স ইত্যাদি ভ্যাকসিন এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে দূর অথবা নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং ২. অসংক্রামক ব্যাধি - ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, প্যারালাইসিস, গ্যাসট্রিক ইত্যাদি রোগ সমূহ সুচিকিৎসার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

দেশের প্রতিটি গ্রামে জনপদে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিভিন্নস্থানে অসংখ্য ঔষধের দোকান রয়েছে যেখান থেকে সকল শ্রেনীর জনগন সামর্থ্য অনুযায়ী চিকিৎসা সেবা নিয়ে থাকে। ঐ সকল চিকিৎসা কেন্দ্রে যারা কর্মরত এবং ঔষধ বিক্রি করে তারা অধিকাংশই স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত নয়। উপরন্তু শুনে অথবা অন্যকে অনুকরণ করে চিকিৎসা দিয়ে থাকেন। ফলে চিকিৎসা সেবায় নানাবিধ জটিলতা সৃষ্টি হয় যা সমাধান করা অনেক সময় ব্যয় সাধ্য ও ঝুকিপূর্ণ হয়ে পরে। দেশের আনাচে-কানাচে লক্ষ লক্ষ স্বাস্থ্য কর্মী, স্বাস্থ্য সহকারী, ঔষধ ব্যবসায়ী, কম্পাউন্ডার ও অদক্ষ পল-ী চিকিৎসক রয়েছেন যাদের আরও অভিজ্ঞ এবং সঠিক জ্ঞান অনুশীলনের মাধ্যমে সুদক্ষ করে গড়ে তোলাই-এ প্রোগ্রামের লক্ষ্য। এর ফলে শিক্ষার্থীদের স্ব-স্থানে বসে জ্ঞান অর্জনের সুবিধার্থে প্রতিটি বিষয়ের উপর হাতে কলমে কাজ শিখবেন যা দ্বারা স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টির উপর অধিক দক্ষতা সৃষ্টি হবে।

দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে স্বাস্থ্য শিক্ষা একটি নতুন ধারণা-যাতে স্বাস্থ্যকর্মীগণ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সমর্থ হয়। দুর্ভাগ্য হলেও সত্য যে, আমাদের দেশের অপ্রতুল স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক জ্ঞানের অভাবে নিজেদের সামর্থকে সমাজে সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারে না। দূরশিক্ষণ শিক্ষা একটি অগ্রসরমান শিক্ষা ব্যবস্থা যাতে একই সময়ে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী স্ব-স্থানে অবস্থান করে বাধাধরা নিয়মের বাহিরে সহজলভ্য ভাবে লেখাপড়া করতে পারে। শিক্ষার্থীকে ভর্তির সাথে সাথেই পাঠ উপকরণ দেয়া হয় যা সহজে বোধগম্য। অন্যের সাহায্য ছাড়াই নিজের পড়া নিজের সুবিধামত সময়ে নিজেই পড়তে পারে। গ্রাম বাংলার অসহায় মানুষ সামান্য অসুখে ও অকাল মৃত্যু বা ভোগান্তির কাছে অসহায়ভাবে বন্দী, এ এক নিষ্ঠুর নিয়তি, নির্মম বাস্তবতা। এ অবস্থা থেকে উত্তরনের লক্ষ্যে এবং তৃণমূল পর্যায়ে সেবার মান উন্নয়ন ও সময়োপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ স্বাস্থ্য বিষয়ক মানবসম্পদ তৈরীর উদ্দেশ্যে দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে কমিউনিটি স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রোগ্রাম চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে।

উদ্দেশ্য:

১। স্বাস্থ্য বিষয়ক দক্ষ মানবসম্পদ তৈরী করা।
২। রোগ প্রতিরোধে স্বাস্থ্য সচেতনতার সুযোগ সৃষ্টি করা।
৩। অদক্ষ ঔষধ বিক্রেতাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।
৪। শিশু ও মাতৃ স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা এবং মৃত্যুহার কমাতে সাহায্য করা।
৫। প্রাথমিক চিকিৎসার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে সকলের বিশেষ করে গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়ন করা।

বেসিক এনাটমী

পাঠ ১: কোষ

এই পাঠ শেষে আমরা জাসতে পারব -

- Cell বা কোষ কি?
- Cell এর মধ্যে কি কি অংশ আছে এবং এর বিভিন্ন অংশের কাজ কি?

মানব দেহ অসংখ্য ঈবষষ বা কোষ নিয়ে গঠিত, এই কোষ বা Cell ই হলো শরীরের মূল ভিত্তি। জীব দেহের গঠন মূলক ও কার্যকরী একক হল কোষ।

Cell বা কোষ দেহের সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম কার্যকরী অংশ।

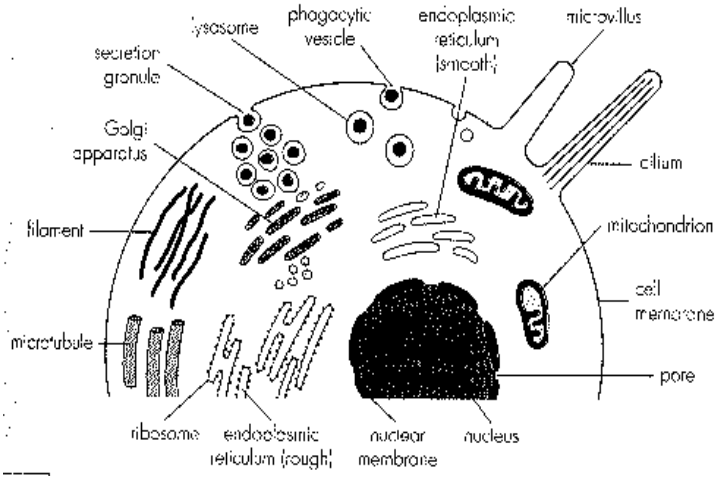

Cell কে আমরা এভাবে ভাগ করতে পারি। যেমন-

একটি Cell বা কোষের দু'টি অংশ থাকে-

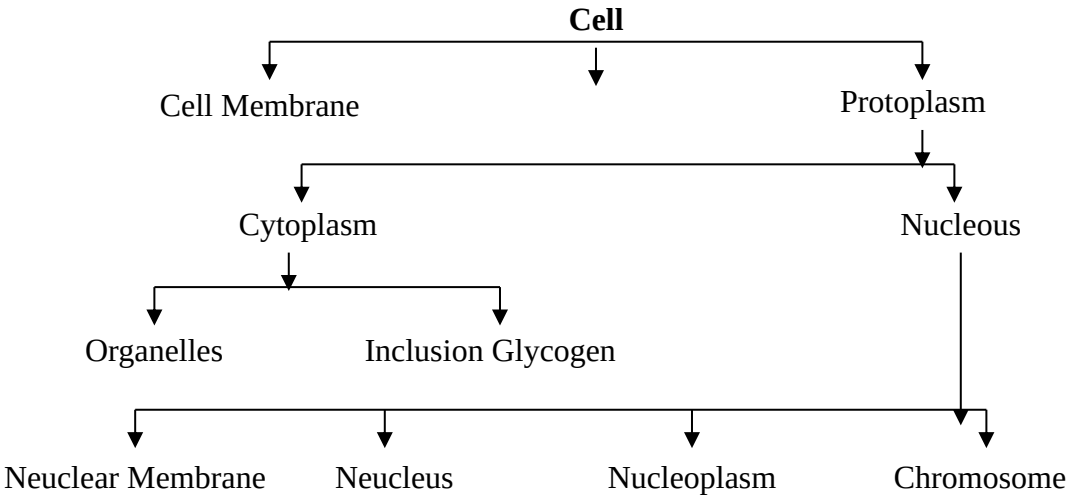

এখন আমরা কোষের বিভিন্ন অংশ নিয়ে বিস্ড়ারিত আলোচনা করবো। আমরা জানি একটি Cell বা কোষ-এর প্রধানত দু'টি অংশ থাকে। যেমন-

১. Cell membrane বা কোষ প্রাচীর
২. Protoplasm প্রোটো প-াজাম।

 Cell membrane: প্রতিটি কোষ যে সূক্ষ্ম, স্ড়িতি স্থাপক, Semi permeable, সজীব, পাতলা আবরনী দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে তাকে Cell membrane বলে।

এখন আমরা দেখবো Cell membrane এর কাজ কি?

- Cell membrane: বা কোষ প্রাচীর কোষের আকৃতি ঠিক রাখে
- বাইরের আঘাত থেকে ভিতরের সজীব বস্তুকে রক্ষা করে এবং
- বাহিরের ও ভিতরের বিভিন্ন দ্রব্যাদি যাতায়ত ও সমন্বয় করে।

Protoplasm- কোষ প্রাচীরের ভিতরে স্বচ্ছ, ঘন ও জটিল বস্তু থাকে তাকে প্রোটোপ-াজম বলে। ইহাই জীবনের মূল সত্তা।

প্রোটোপ-াজমকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

a. Cytoplasm
b. Nucleous

Cytoplasm- প্রোটো প-াজামের নিউক্লিয়াসকে বাদ দিলে যে স্বচ্ছ, ঘন ও তরল পদার্থ থাকে তাকেই সাইটো প-াজাম বলে। সাইটো প-াজামের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার organelles থাকে। Cytoplasm এর মধ্যে ৭৫% পানি এবং বাকী ২৫% থাকে organic এবং in organic পদার্থ। Cytoplasm এর ভিতর বিভিন্ন সজীব বস্তু পাওয়া যায়। যেমন-

- Mitochondria,
- Golgi Complex
- Ribosome
- Lysosome
- Centrosome etc.

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আসুন এবার আমরা এই ছোট ছোট বিভিন্ন অংশের গঠন ও কাজ সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করি।

প্রথমে আসা যাক Mitochondria কি?

Mitochondria- সাইটো প-াজামের মধ্যে দন্ডাকার তন্তুকার বৃত্তাকার প্রভৃতি কতগুলো বিবিধ আকৃতি বিশিষ্ট যে বস্তু দেখতে পাওয়া যায় তাদেরকে mitochondria বলে। Mitochondria দু'টি আবরনী দিয়ে তৈরী। বাহিরের আবরনটি মসৃন, কিন্তু ভিতরের আবরনীটি স্থানে স্থানে ভাজ হয়ে ভিতরের দিকে ঝুলে থাকে, এভাজগুলোকে christae এর ভিতওে অর্ধ তরল দানাদার পদার্থকে সধঃথী বলে।

Mitochondria একটি ঈবষষ অত্যান্ড় গুর"ত্ব পূর্ণ কাজ করে।

- **Mitochondria ATP** বা শক্তি উৎপাদন করে দেহে সরবরাহ করে এ জন্য Mitochondria কে Power hours of the cell বা কোষের শক্তি ঘর বলে।
- Mitochondria হরমোন নিঃসরনে সাহায্য করে।
- DNA সংশে-ষন করে।
- ডিম্ববানু ও শুক্রানু গঠনে সহায়তা করে RNA তৈরী করে।

এর পরে আসি **Golgi Complex** কি?

Golgi Complex- Cytoplasm-এ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কনার মত সর" অথবা সূক্ষ সুতার মত বস্তু থাকে। এগুলোকে Golgi Complex বলে।

আসুন এবার আমরা জানতে চেষ্ঠা করি এই ক্ষুদ্র পদার্থগুলি কোষে কি কাজ করে-

- এরা হরমোন নি:সরনে ও ভিটামিন তৈরীতে সাহায্যে করে এবং
- পুর"ষ প্রানীর ক্ষেত্রে শুক্রানুর এ্যাকোসোম তৈরী করে
- মাইটোকনডিয়াকে অঞচ তৈরীতে সাহায্য করে।

Ribosome কি?

Ribosome প্রতিটি জীবিত কোষের Cytoplasm I Endoplasmic Reticulum- এর বর্হি: গাত্রে অবস্থিত রাইবো নিউক্লিও প্রোটিনের সমন্বয়ে গঠিত যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কনাগুলো প্রোটিন সংশে-ষনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে তাদেরকে জরনড়ংড়সব বলে।

এদের কাজ হলো-

- প্রোটিন সংশে-ষনে সহায়তা করা:.
- সংশে-ষিত প্রোটিনকে গলজি দ্রব্যে প্রেরনে সাহায্য করা।

এর পরে আসা যাক Lysosome কি?

কোষের cytoplasm অবস্থিত সুক্ষ আবরনী বেষ্টিত কোষীয় খাদ্য পরিপাককারী ক্ষুদ্র অঙ্গকে Lysosomes বলে। Lysosomes **কাজ হলো-**

- কোষ বিভাজনে খুংড়ংড়সবং কোষ আবরনী ভাঙ্গতে সাহায্য করে।
- সংক্রামক ব্যাকটেরিয়া অথবা ভাইরাস আক্রমন প্রতিরোধ করে।
- জীব দেহের অকেজো কোষকে ধ্বংস করে।

Endoplasmic Reticulum কোষের Cytoplasm এ অবস্থিত এক ধরনের নালিকাকার অঙ্গ। এরা পাস্পপারিক সংযোগ করে এক ধরনের জালিকার সৃষ্টি করে। এদের কাজ হলো-

- কোষের Cytoplasm এর কাঠামো দান করা এবং নিউক্লিয়াসের সংশ্লেষিত RNA এই জালকের পথে পরিবাহিত হয়।

Centrosome- হলো cell এর nuclues এর পাশে অবস্থিত এবং cell division এর স্পিনজাল সৃষ্টি করতে পারে। এমনি এক ধরনের ঘন, গোলাকার বস্তুকে centrosome বলে।
মাইটোটিক কোষ বিভাজনে ক্রমোজোমের গমনে এদের বিশেষ অবদান আছে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, মনে রাখবেন- ***উদ্ভিদ কোষে centrosome থাকে না।***

শিক্ষার্থী বন্ধূরা এবারে আমরা cell এর সব চেয়ে গুরুত্ব পূর্ণ অংশ Nucleous সম্পর্কে আলোচনা করবো।

Nucleous- নিউক্লিয়াস হল cell এর প্রাণ। নিউক্লিওয়াস ছাড়া কোন কোষ বা Cell বাঁচতে পারে না। এ জন্য একে কোষের প্রাণ কেন্দ্র বলা যায়। ইহা কোষের সকল কাজকে নিয়ন্ত্রন করে।

নিউক্লিয়াস আবার ৪টি অংশে বিভক্ত।

- Neuclear membrane
- Ncucleoplasm
- Chromosome
- Ncucleoles

Nuclear Membrane- নিউক্লিয়াস যে স্বচ্ছ, দ্বিস্ড়রী অর্ধভেদ্র ও অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত কোমল পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে তাকে Nuclear Membrane বলে। এই পর্দা নিউক্লিও প-াজমাকে আবৃত করে রাখে ও নিউক্লিয়াসকে আকৃতি দান করে, রক্ষন করে।

Nucleoplasm- এটা নিউক্লিয়াসের মধ্যকার দানাদার স্বচ্ছ, সমস্বত্ব, তরল পদার্থ। এর মধ্যে নিউক্লিও প্রোটিন নিউক্লিক এসিড, এনজাইম ও খনিজ লবন থাকে। ইহা Nucleus-এর জৈবিক কাজকে নিয়ন্ত্রন করে এবং উঘঅ, RNA ও Protein তৈরীতে অংশ নেয়।

Nucleolus- Nucleolus এ অবস্থিত ঘন, গোলাকার, বস্ড়টির নাম নিউক্লিওলাস। ইহা Protein, Lipid, DNA এবং RNA দ্বারা গঠিত।

ইহা কোষ বিভাজনে অংশ নেয়। RNA, Ribosomes এবং Protein সংশে-ষনে অংশ নেয়।
Chromosome– Nucleoplasm এর মধ্যে কতগুলি সুতার মত দানাদার বস্তু প্যাচানো অবস্থায় দেখা যায়। এদের প্রতিটাকে Chromosome বলে।

Chromosome- DNA ধারন করে Protein সংশে-ষনে অংশ নেয়। কোষ বিভাজন নিয়ন্ত্রণ করে। এরা বংশ গতির ধারক ও বাহক। মানব কোষে ৪৬ chromosome cell থাকে। ক্রমোজমে জীন থাকে যার মাধ্যমে মা-বাবার বৈশিষ্ট্য সন্ড়ানদের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়।

পাঠ ২: কলা বা Tissue

এই পাঠ শেষে আমরা জাসতে পারব -

- Tissue বা কলা কি?
- কি কি ধরনের Tissue আছে?
- বিভিন্ন প্রকারের টিস্যু মানব শীররের কোথায় থাকে এবং এদের কাজ কি?

টিস্যু/কলা কি?

টিস্যু হল কতগুলি Cell বা কোষ এর সমষ্টি যার উৎপত্তি আকার এবং কাজ অভিন্ন। আকার ও গঠনের দিক থেকে একই প্রকারের কতগুলি কোষ যখন কোন নির্দিষ্ট স্থান থেকে উৎপন্ন হয়ে একই রকমের শারীর বৃত্তীয় কাজ সম্পাদন করে তখন তাকে টিস্যু বা কলা বলে।

অথার্ৎ Tissue is a collection cells similar shape, function and origin।

Tissue কে প্রধানতঃ চার ভাগে ভাগ করে যায়।

১। Epithelial tissue (আবরনী কলা)।
২। Connective tissue (যোজক কলা)।
৩। Muscular tissue (পেশী কলা)।
৪। Nervous tissue (স্নায়ু কলা)।

এখন আমরা দেখব Epithelial tissue কি?

Epithelial tissue may be defined as a collection of closely packed cells with very little intercellular substance অর্থাৎ ইপিথিলিয়াল টিস্যু কতগুলি কোষের সমষ্টি, যেগুলি নিবিড়ভাবে থাকে এবং কোষগুলির ফাকে মাটিক্স কম থাকে।

এখন আমরা ইপিথিলিয়ার টিস্যুর কাজ নিয়ে আলোচনা করব।

সাধারণত It covers the external and internal surface of the body. Epithelial tissue প্রধানত: নিচের কাজগুলি করে থাকে। যেমন-

1. Protection- covering and lining the surface
2. Absorption
3. Secretion
4. Sensory function
5. Contraction function

বৈশিষ্ট্য- কোষগুলি এলোমেলো না থেকে, এক বা একাধিক স্তরে বিন্নস্ত থাকে।

এই Tissue কোষগুলির maximum cellular element থাকে কিন্তু inter cellar substance কম। Blood supply কোন কোন ক্ষেত্রে থাকে অথবা থাকে না।
এর Repairing capacity বেশি থাকে।

কাজ অনুযায়ী epithelial tissue কে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।
যেমন-

1. Covering epithelium
2. Glandular epithelium

Covering epithelium কে আবার কোষ স্ড়র অনুযায়ী বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

১। Simple epithelium tissue (সরল আবরনী কলা): যখন কোষগুলি একটি মাত্র স্ড়রে বিন্যস্ড় থাকে তখন তাকে সরল আবরনী কলা বলে।

আচ্ছাদন/ Covering ছাড়াও ইহা বৈচিত্র ধর্মী কাজ করে থাকে। কোষের গঠনের উপর ভিত্তি করে একে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

ক. Squamous Epithelial Cell: কোষগুলি চ্যাপটা ও বহুভূজাকার নিউক্লিওয়াস বেশ বড়, গোলাকার এবং কোষের কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করে। Blood vessels, serous cavity, alveoli of lung intestine প্রভৃতি স্থানের আবরনীতে এই কোষগুলি পাওয়া যায়।

খ. Cuboidal Epithelial Cell: এই কলার কোষগুলির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা সমান। নিউক্লিয়াস এর কেন্দ্রস্থলে থাকে। ইহা Pancreas, kidney আন্ড়-আবরনী এবং ovary বাহিরের আবরনীতে থাকে।

গ. Columnar Epithelial Cell এই tissue কোষগুলির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ অপেক্ষা অনেক বেশি। নিউক্লিয়াস সাধারণত: নিচের দিকে থাকে। কোষের মুক্ত প্রান্ড় খাজ কাটা থাকে।

২। Stratified Epithelial: এই টিস্যুর কোষগুলি একাধিক স্ড়রে বিনস্ড়্য থাকে। কোষের গঠনের উপর ভিত্তি করে এই Tissue কে আবার চার ভাগে ভাগ করা যায়।

ক) Squamores Stratified: দেহের যে সব স্থান অনবরত ঘর্ষনের সম্মুখীন হয় ঐ সকল স্থানে এদের বেশী দেখা যায়। যেমন- Skin, oral cavity inner lining, tongue, larynx, vagina, esophagus etc.
খ) Cuboidal stratified: ঘাম গ্রন্থির নালিকায়, শুক্রানু ও ডিম্বানেশয়ে এই Tissue পাওয়া যায়।

গ) Columnar stratified: মলাশয় ও পুর"ষের মুত্রনালীর প্রশস্থ অংশে এ ধরনের Tissue পাওয়া যায়।

ঘ) Transitional Stratified: Urinary bladder ureter and kidney-তে এই ধরনের Tissue থাকে।

৩। Simple and Stratified Epitheliums ছাড়া ও আর এক ধরনের Epithelium পাওয়া যায়। এগুলোকে Psendostratified Epithelium বলে এগুলো বিভিন্ন উচ্চতায় থাকে। এবং এর নিউক্লিয়াস ও বিভিন্ন level থাকে যার জন্য এই Tissue-তে অনেক স্ড়র আছে বলে মনে হয়।

যা Lining of Trachea, bronchi and nasal cavity তে পাওয়া যায়।

পূর্বেই আমরা জেনেছি, আবরনী কলা বা Epithelium Tissue, Covering এবং Glandular Epithelium, এই দুই ভাগে বিভক্ত। এতক্ষন আমরা Covering Epithelium এর বিভিন্ন ভাগ দিনে আলোচনা করলাম। এখন আমরা দেখব Glandular Epithelium কি? এখানে Glands হল কতগুলি কোষের সমষ্টি। যার উদ্দেশ্য Secretion and excretion. কিছু কিছু আবরনী কলার নির্দিষ্ট কতকগুলি কোষ হতে তরল পদার্থ ক্ষরিত হয়। এই কোষগুলিকে গ্রন্থি Gland বলে। Gland হতে ক্ষরিত রসে enzyme, mucous, fat প্রভৃতি থাকে। এই Gland গুলি আবার এক কোষ বা (unicellular) এবং বহুকোষী বা (Multicellular) হয়ে থাকে। বহুকোষী Gland আবার দুইভাগে বিভক্ত একটিকে বলা হয় Endocrine gland এবং অপরটিকে বলা হয় Exocrine gland ।

পাঠ ১.৩: Connective Tissue

এখন আমরা জানব Connective Tissue এর কাজ কি?

- দেহের বিভিন্ন অঙ্গ বা কলার মধ্যে যোগ সূত্র সৃষ্টি কর।
- কঙ্কাল গঠন করে দেহের কাঠামো প্রদান করে।
- বিভিন্ন অঙ্গের সংরক্ষন ও চলাচলে সাহায্য করে।
- আন্ড়: কোষীয় বিভিন্ন পদার্থকে কোষের ভিতরে পরিবহনে সাহায্য করে।
- দেহে প্রবিষ্ট ক্ষতিকারক পদার্থ ও জীবানু থেকে দেহকে রক্ষা করে।
- রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।
- দেহের ভার বহন, মেদ সঞ্চয়, তাপ রক্ষন ও তাপমাত্র নিয়ন্ত্রন করে।

Connective Tissue কি?

যে টিস্যু দেহের বিভিন্ন টিস্যু বা তন্ত্রকে সংযুক্ত করে এবং প্রতিরক্ষামূলক ভূমিকা পালন করে তাকে Connective Tissue বলে।

এ ধরনের টিস্যুতে Inter cellular substance বেশি থাকে।

এ Tissue এর কোষগুলো সাধারণত নির্দিষ্ট স্ড়রে বিন্যস্ড় থাকে না, এর Cell গুলো Matrix-এ ছড়ানো Cell থাকে।
কোষগুলোর ফাঁকে ফাঁকে প্রচুর Matrix থাকায় Cell গুলি ফাকা ফাকা থাকে।

Mesoderm থেকে এ Tissue উৎপন্ন হয়।

এর Blood supply and nerve supply দুটোই আছে।

Connective টিস্যুর মধ্যে বিভিন্ন প্রকার Cell থাকে। যেমন-
- Fibroblast
- Macrophages
- Mast Cells
- Plasma Cell
- Leucocytes
- Fat Cell
- Pigment Cell

এখন আমরা জানতে চেষ্টা করব- এই Cell গুলি কি কাজ করে। প্রথমেই আসা যাক-

Fibroblast কি এবং কি কাজ করে

এই Cell গুলি সবচেয়ে বেশী থাকে। Young Fibroblast গুলি আকার বড়, চ্যাপ্টা এবং branching থাকে। এবং পরিনত fibroblast গুলি spindle shaped হয়।

Fibroblast: Collagen, clastic fibre and intercellular substance তৈরী করে এবং ক্ষত নিরাময়ে সাহায্য করে।

Macrophage: এইগুলি সাধারণত star shaped বা spindle shaped-এর হয়। এবং এদের নিউক্লিয়াসের আকৃতি kidney এর মত।

Macrophage এর কাজ হলো-

- এরা বাহির থেকে দেহের ভিতরে প্রবিষ্ট ক্ষতিকারক বস্তুকে ধ্বংস করে।
- এরং রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে।

Mast Cell কি?

এ Cell গুলো সাধারণত ডিম্বাকৃতি, নিউক্লিয়াস spherical and মধ্যবর্তী স্থানে থাকে। Mast cell এর মধ্যে হেপারিন, ও হিস্টামিনের কনা থাকে।

যার জন্য এরা অ্যালার্জি নিয়ন্ত্রনে গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

Plasma Cells: সাধারণত দেখতে ডিম্বকৃতি এবং আকারে বড় হয় এবং নিউক্লিয়াস এক পাশে থাকে। কোষের ভিতরে অনেক বেশি Endoplasmic reticulum থাকে।

এরা শরীরে এন্ডিবডি তৈরী করে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

Fat Cell: এই Cell গুলি মূলত fat এর Store house হিসেবে কাজ করে। Cell গুলি সম্পূর্ণ Fat droplets দিয়ে ভর্তি থাকে। যার জন্য Cell membrane এর নীচে Cytoplasm-এর সামান্য layer থাকে এবং Nucleus ও এক পাশে চেপে থাকে।

এতক্ষন আমরা Connective tissue বৈশিষ্ট্য কাজ এবং এর বিভিন্ন প্রকার Cell সম্পর্কে জানলাম।

আমরা আগেই জেনেছি যে, Connective tissue এর মধ্যে Inter cellular substance বেশি থাকে। এই Inter cellular, substance, ground substance এবং fibre নিয়ে গঠিত।

Ground substance হল।

- Glycoprotein
- Glycosaminoglycons

এবং তিন রকমের Fibre থাকে যেমন-

- Collagen fibre
- Elastic fibre
- Reticular fibre

এখন আমরা দেখব Connective tissue কে কয় ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রাথমিক ভাবে Connective tissue কে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন–

- Connective tissue proper
- Connective tissue with special properties
- Supporting connective tissue
- Supporting connective tissue সাধারণত দুই ধরনের হয়

১। Cartilage বা তরুনাস্থি: ইহা নরম অথচ দৃঢ় ও স্থিতিস্থাপক। ইহা কনড্রিন নামক ঘন ও স্থিতিস্থাপক পদার্থ দ্বারা গঠিত। Cartilage কে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

- Hyaline cartilage: ইহা Nose, Respiratory tract vocal card-এ পাওয়া যায়।
- Fibrous cartilage: দুইটি মাধ্যবর্তী স্থানে পাওয়া যায়।
- Elastic cartilage: Pinna, আল জিহ্বা, ইউষ্ট্যাশিয়অর নালী।

২। Bone বা অস্থি: ইহা দেহের সর্বাপেক্ষা সুদৃঢ় কলা। ক্যালসিয়াম কার্ববোনেট জমা হয়ে একে শক্ত করে। এর Matrix-এ বিভিন্ন organic (40%) এবং inorganics (60%) পদার্থ থাকে। Matrix-এ osteocytes বা অস্থি কোষগুলো ছড়ানো থাকে। পেরিঅষ্টিয়াম নামক তন্ত্রময় connective tissue নির্মিত পাতলা ও মসৃন আবরনী প্রতিটি অস্থিকে ঘিরে রাখে। এ কলা মানুষকে দৈহিক কাঠামো দেয়।

ঘনত্ব ও দৃঢ়তার ভিত্তিতে Bone কে দুইভাগে ভাগ করা হয়। যেমন-

- Compact bone
- Spongy/ cancellous bone

এর পরে আমরা আসব Lesson 4 এ, এখানে Muscular Tissue বা পেশী কলা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ১.৪: পেশী কলা বা Muscular Tissue

পেশী কলা বা Muscular Tissue কি?

যে টিস্যু সংকোচন বা প্রসারনক্ষম এবং অষংখ্য তন্তু বা Fibre এর সমন্বয়ে গঠিত তাকে Muscular Tissue বা পেশী কলা বলে। পাঠ ১.৪

এই টিস্যু সেল বা কোষগুলি লম্বা সুতার মত এগুলোকে Fibre বলে।

কোষগুলির নিউক্লিয়াস অত্যন্ড়।

প্রতিটি কোষ Sarcolomma পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে।

Muscular tissue মধ্যে ৭৫% পানি এবং বাকী অংশে বিভিন্ন প্রকার প্রোটিন থাকে। যেমন- অ্যাকটিন মায়োসিন, টুপোমায়েসিন। **Muscular Tissue কাজ কি?**

এই Muscular tissue প্রাণী দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালনে সাহায্য করে আমাদের Movement-এ সাহায্য করে।

অস্থি সংলগ্ন পেশী সমূহের সংকোচন ও প্রসারনের ফলে আমরা একস্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারি। এই টিস্যু তাপ উৎপন্ন করে শরীরের তাপমাত্রা ঠিক রাখে।

সাধারনত: তিন ধরনের Muscle থাকে। যেমন-

1. Skeletal muscle
2. Cardiac muscle
3. Smooth muscle

1. Skeletal muscle: কতগুলি Long cylindical, mutinucleated cell দ্বারা গঠিত। প্রত্যেক muscle fibre পেশীতন্ত্র connective tissue shealth দ্বারা আবৃত থাকে। এই muscle fibre নিম্নলিখিত বস্তুগুলি ধারণ করে-

1. Sarcolemma: The cell membrane
2. Sarcoplasm: The cytoplsm of the cell
3. Nucleus: They are multiple
4. Myofibrils and myfilamets
5. Sarcosome: Mitochondia
6. Sarcoplasmic reticulum- endoplasmic reticulum of musdofibre

২। **Cardiac Muscle (কার্ডিয়াক পেশী):** মের“দন্ডী প্রানীদের হৃপিন্ড এক ধরনের বিশেষ অনৈচ্ছিক পেশী দ্বারা গঠিত। ইহাকে কার্ডিয়াক পেশী বলে। এই Muscle-এর সংকোচন ও প্রসারণ ক্ষমতা মধ্যম মানের। ইহারা কখনও ক্লান্ড় হয় না। হৃদপিন্ডে সংকোচন ও প্রসারন ঘটাইয়া প্রানীদেহে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রন করাই ইহার কাজ।

৩। Smooth muscle কোষগুলি Elongated এবং Spinde shaped কোষের শেষ প্রান্ড় tapering এর মধ্যবর্তী স্থান প্রশস্থে। Cardiac এবং smooth muscle কে Non-striated muscle বলা হয়।

কাজ অনুযায়ী সাধারনত দুই ধরনের muscle দেখা যায়।

- Straicd muscle/ voluntary muscle- skeletal
- Non-straied muscle/ involuntary muscle- cardiac/smooth

Straicd Musele ঐচ্ছিক পেশী

ইহা প্রানীর ইচ্ছা অনুযায়ী সংকুচিত ও প্রসারিত হতে পারে।
এ ধরনের পেশী চোখ, জিহ্বা, হাত, পা ও হাড়ের গায়ে পাওয়া যায়।
গঠন: কোষগুলি নলাকার, অমসৃন ও আড়া আড়ি ভাবে থাকে এর গায়ে ডোরা কাটা দাগ থাকে। ফাইবার গুলি আলাদা না থেকে গুচ্ছাকারে অবস্থান করে।

Non-straied Muscle/অনৈPক পেশী অনৈ”ছক

এই পেশীর সংকোচন ও প্রসারন স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং এদের সংকোচন ধীর গতিতে হয়।
এ পেশীর কোষগুলির দুই প্রান্ড় সর“ এবং মধ্য ভাগ প্রশস্ড়। প্রতিটি কোষে নিউক্লিয়াসের সংখ্যা ১টি এবং উহা কোষের প্রশস্ড় অংশে অবস্থান করে।

এর অবস্থান: Blood vessels gall bladder, stomach, small intestine, large intestine, uteres-এর প্রাচীরে থাকে।

এদের কাজ- উত্তেজনায় সাড়াদেয় পরিবহন ও পেশীচালনা নিয়ন্ত্রনসহ অন্যান্য কাজ করে।

এই অংশে স্নায়ু টিস্যু বা Nervous tissue সর্ম্পকে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমেই আমরা দেখব Nervous tissue কি?

যে টিস্যু বা কলা কোন উদ্দীপনা গ্রহণ করে উহার উপযুক্ত প্রতিবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম তাকে স্নায়ু কলা বা Nervous tissue বলে। স্নায়ু টিস্যু দুই ধরনের কোষ নিয়ে গঠিত।

১। Neurons (উদ্দীপক কোষ)।

২। Supportion cells (নন উদ্দীপক কোষ)।

নিউরন: স্নায়ুকলার প্রতিটি কোষকে নিউরন বলে। প্রতিটি নিউরণ

1. Cell body
2. Cell process

i. Axon
ii. Dendrite নিয়ে গঠিত।

Classification of Neurons

১। Uniplor ১ টি process থাকে।
২। Bippolar ২ টি process থাকে।
৩। Pseudounipolar দুইটি process যুক্ত হয়ে ১টি process form করে।
৪। Mutipolar ১ টি Axon এর সাথে অনেক Dendrite থাকে।

On the basis of brancing pattern, shape of dendrite field অনুযায়ী নিউরনকে আবার ৪ ভাগে ভাগ করা যায়।

১। Stellate কোষের body ছোট থাকবে এবং dendrite কোষের body বস দিকেই থাকবে।
২। Pyramidal- Cell body pyramidal এবং conical shape-এর মত হবে।
৩। Fusiform- sipindles shaped
৪। Glomerular-এখানে কিছু কিছু dendrite সম্মুখ ভাগ খুবই প্যাচানো থাকে।

স্নায়ু কলার কাজ নিয়ে আলোচনা করব।

ব্যহিক বা দেহাভ্যন্ড়রীন পরিবেশ হতে উৎপন্ন বিভিন্ন উদ্দীপকের প্রভাবে দেহ যে সাড়া দেয় তাহা স্থায়ু কলার মাধ্যমে যথাযথ জায়গায় পৌছে। Dendrite এর মাধ্যমে উদ্দীপনা কোষ দেহে বহন করে নিয়ে যায় এবং Axon এর মধ্যে কোষ দেহ থেকে অন্য নিউরনের দিকে প্রবাহিত হয়।

বিভিন্ন উদ্দীপনা ও ঘটনাকে স্থতিতে সংরক্ষণ করিয়া রাখে।

পাঠ ১.৫: হাড় জোড়া

এই পাঠ শেষে আমরা জানতে পারব -

- Bone বা অস্থি কি?
- Bone বা অস্থি কিসের সমন্বয়ে গঠিত
- Bone বা অস্থির Histological structure কি?
- Bone বা অস্থির কাজ কি

প্রথমে আসা যাক **Bone** বা অস্থি কি?

Bone বা অস্থি হলো- ম্যাট্রিক্সের জৈব উপাদানের সাথে ক্যালসিয়াম কার্বনেট ও ক্যালসিয়াম ফসফেট জাতীয় অজৈব লবন জমা হয়ে যে সৃদৃঢ় ও কঠিন ভারবাহী কলা সৃষ্টি হয় তাকে অস্থি বা Bone বলে।

Bone বা অস্থি Connective tissue নির্মিত এক জটিল গঠনের অঙ্গ। এই কলা শক্ত বা স্পঞ্জ জাতীয় পদার্থে গঠিত। ইহা আমাদের দেহের কাঠামো প্রদান করে। অস্থির ভিতরে অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে যুক্ত থাকে অস্থিমজ্জা বাম্যাট্রিক্স। অস্থির ম্যাট্রিক্সে বিভিন্ন প্রকার অস্থি কোষ বা Bone cell এবং Intercellular substances থাকে। আর বাহিরে থাকে অস্থি আবরনী বা Periosteum. অন্যান্য অঙ্গের মত প্রতিটি অস্থিতে Blood, lymph এবং Nerve supply থাকে।

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, অস্থি কোষ বা Bone cell তিন ধরনের হয় যেমন-

1. Osteocytes
2. Osteo blasts
3. Osteoclasts

এবং ইন্টারসেলুলার পদার্থের মধ্যে থাকে পানি, কোলাজেন ফাইবার, সিমেন্ট Subs. ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরস, বাই-কার্বনেট এবং সাইট্রেট। প্রতিটি অস্থি অসংখ্য লম্বা লম্বা ইউনিট নিয়ে গঠিত। ইহার প্রত্যেকটি ইউনিটকে হাভারশিয়ান ক্যানাল সিস্টেম বলে।

প্রতিটি হাভারশিয়ান সিস্টেম

- হাভারশিয়ান ক্যানাল
- ল্যামেলি
- ল্যাকুনি এবং
- ক্যানোলিকুলিই নিয়ে গঠিত। হাভারশিয়ান ক্যানাল প্রতিটি হাভারশিয়ান সিস্টেমের সেন্টার এ থাকে। এবং এর মধ্যে রক্তনালী, স্নায়ু ও লসিকাবাহী নালী থাকে।

ল্যামেলি কি?

ল্যামেলি- প্রতিটা হ্যাভারশিয়ান সিস্টেম এর চারি পার্শ্বে থাকে। ল্যামেলির মধ্যে মাঝে মাঝে ছোট ছোট স্পেস দেখা যায়, তাকে লেকুনি বলে এবং এই লেকুনির মধ্যে Osteocyte cell থাকে।

আর কানালিকুলি হল পাতলা জালিকার মত। এগুলি ল্যাকুনিকে একটার সাথে আর একটার এবং হ্যাভারশিয়ান ক্যানালের সাথে সংযোগ করে।

বোন বা অস্থির কি কাজ কওে -

- বোন বা অস্থি দেহের কাঠামো দান করে।
- দেহের ভার বহন করে এবং চলাফেরার সাহায্য করে।
- পেশী সংযোজনের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র সৃষ্টি করে।
- অস্থিমজ্জায় রক্ত কনিকা তৈরী হয়।
- দেহের নরম ও গুর"ত্বপূর্ণ অঙ্গ সমূহ যেমন- মতিষ্ক, ফুসফুস, হৃদপিন্ড ইত্যাদি অঙ্গ সমূহকে সুরক্ষিত রাখে।
- অস্থি ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাসের স্টোর হাউস হিসাবে কাজ করে।

অস্থির প্রকার ভেদ (Classification of Bone):

আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মানবদেহের অস্থিগুলিকে সাধারণত ৬ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

১। Long bones (লম্বা অস্থি): যে সব অস্থির মধ্যভাগ নলাকার। প্রান্ড় দুটি স্ফীতকায় ও অস্থি সন্ধি দ্বারা অন্য অস্থির সাথে যুক্ত থাকে। এবং নলাকার অংশের কেন্দ্র ফাঁপা ও অস্থি মজ্জা পূর্ণ, তাহাদের লম্বা অস্থি বা Long bone বলে। যেমন হিউমারাস ফিমার।

২। Short bone বা খাঁটো অস্থি। যে সমস্ড় অস্থির আকৃতি ছোট হলেও যথেষ্ট দৃঢ় হওয়ায় অধিকতর চাপ সহ্য করতে পারে তাদেরকে Short বা খাটো অস্থি বলে। যেমন হাত বা পায়ের অস্থি।

৩। ফ্লাট বোন বা চেপ্টা অস্থি: যে সব অস্থি বিশেষ প্রয়োজনে বৃদ্ধি পেয়ে থালা আকৃতি ধারন করে তাদেরকে Flat বোন বা চাপা অস্থি বলে। যেমন, স্টারনাম, স্কাপুলা।

৪। ইররেগুলার অস্থি: একই শ্রেণীর অস্থির মধ্যে যখন আকৃতি গত বৈশ্যদৃশ্য দেখা যায়। যেমন Carpal bone, কশের"কা।

৫। Pheumatic bone (বায়ুপূর্ণ অস্থি): যে সব অস্থি বায়ুপূর্ণ স্থান যুক্ত বা র"ক্ত পূর্ণ গহ্বর যুক্ত এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নাসাগহ্বড়ের সাথে যুক্ত তাকে বায়ুপূর্ণ অস্থি বলে। যেমন- উপরের চোয়াল (ম্যাক্সিলা)।

৬। সিসাময়েড বোন Seasomoid bone): Patella bone.

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এতক্ষণ আমরা বোনের বিভিন্ন প্রকার ভেদ নিয়ে আলোচনা করলাম।

এ পর্যায়ে আমরা অস্থি আবরনী বা পেরিঅসটিয়াম সম্পর্কে কিছু জানব-

হাড়ের চারিদিকে বেষ্টনকারী এবং অস্থি সৃষ্টিাকারী এক বিশেষ ধরনের শক্ত ও পাতলা যোজক কলার স্ড় রকে অস্থি আবরনী বা পেরিঅসটিয়াম বলে। হাড়ের যেখানে তর্নাস্থি থাকে সেখানে এই আবরনী থাকে না।

এতে মাংস পেশী, পেশীর বন্ধনী ও কন্ডরা যুক্ত থাকিয়া অস্থি সঞ্চালনে সাহায্য করে।

অস্থি আবরনী বা পেরি অসটিয়ামের ভিতর দিয়ে রক্ত নালিকা বা স্নায়ু হাড়ে প্রবেশ করে।

এখন আমরা তরুনাস্থি সম্পর্কে জানবো-

Cartilage বা তরুনাস্থি কি?

দেহের অভ্যন্তরের নমনীয়, নরম ও স্থিতিস্থাপক কলাকে তরুনাস্থি বা Cartilage বলে। কার্টিলেজের মাট্রিক্সকে কনড্রিন (Chondrin) বলে।

কনড্রোমিউকয়েড ও কনড্রো এলবুমিনয়েড নামক দুই প্রকার প্রোটিন দ্বারা ম্যাট্রিক্স গঠিত। ম্যাট্রিক্সে হোয়াইট ফাইবার, ইয়োলো ফাইবার এবং কনড্রোসাইট নামক কোষ থাকে।

পেরিকনড্রিয়াম (Perichondrium) আবরন দ্বারা কার্টিলেজ আবৃত থাকে।

ম্যাট্রিক্সের উপর ভিত্তি করে কার্টিলেজ সাধারণত ৩ প্রকার। যথা-

1. Hyaline cartilage
2. Elastic cartilage
3. Fibro cartilage

হায়ালিন কার্টিলেজ কি?

এর মাট্রিক্স নীলাভ, ঈষ্য স্বচ্ছ, সমসত্ব। এতে পরিমিত কোলাজেন ফাইবার থাকে। কোষগুলো ম্যাট্রিক্সে ২-৮ টি গুচ্ছকারে অবস্থান করে। পেরিকনড্রিয়াম দিয়ে আবৃত থাকে। সকল মের্দন্ডী প্রানীয় কঙ্কাল হারালিন কার্টিলেজ দিয়ে তৈরী।

হায়ালিন কার্টিলেজ শরীরে সব চেয়ে বেশি দেখা যায়। যেমন-

- Costal cartilage

- Articular cartilage
- Thyroid and cricoids cartilage
- Cartilage of trachea and bronchi
- Parts of the nasal septum and lateral wall of the nose
- Epi: physial plate of growing long bones.

ইলাসটিক কার্টিলেজঃ

এ কার্টিলেজ হায়ালিণ কার্টিলিজের মতই। তবে এক্ষেত্রে অস্বচ্ছ ম্যাট্রিক্সে পীতাভ স্থিতি স্থাপক তন্তু জালকের আকারে বিন্যস্ড় থাকে।

বহিঃ কর্ণ, ইপিগ-টিস, স্বরযন্ত্র, নাকের অগ্রভাগ ইত্যাদি স্থানে এ ধরনের কার্টিলেজ থাকে।

ফাইব্রো কার্টিলেজ

ম্যাট্রিক্সে কোলাজান তন্তু গুচ্ছাকারে বিনস্ড়্য থাকে। এখানে পেরিকনডিয়াম আবরন অনুপস্থিত।

অস্থির সাথে টেনডন বা লিগামেন্টের সংযোগ স্থলে, দুটি কশেরুকার সংযোগ স্থলে, পিউবিক সিমফাইসিলে এ ধরনের কার্টিলেজ থাকে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমরা Joints অস্থি সন্ধি সম্বন্ধে আলোচনা করবু

- Joints বা অস্থি সন্ধি কি?
- Joints দেখতে কেমন এবং
- অস্থি সন্ধি কি কাজ করে।

অস্থি সন্ধি কি?

কোন ও একটি কার্টিলেজ বা অস্থি অপর একটি কার্টিলেজ বা অস্থির সাথে সংযুক্ত হয়ে অস্থিসন্ধি বা Joint গঠন করে। অর্থাৎ দুই বা ততোধিক কার্টিলেজ বা অস্থির মিলনস্থলকে অস্থি সন্ধি বা Joint বলে।

অস্থি সন্ধি বা Joint সাধারণতঃ তিন ধরনের হয়। যেমন-

১। সাইনোভিয়াল বা গহ্বরযুক্ত অস্থি সন্ধি
২। কার্টিলেজিনাস বা তরুনাস্থিময় অস্থি সন্ধি
৩। ফাইব্রাস বা তন্তুময় অস্থি সন্ধি

সাইনোভিয়াল সন্ধিঃ দেহের অধিকাংশ অস্থি সন্ধি এই ধরনের। এই অস্থি সন্ধিকে সচল অস্থি সন্ধি বলে।

সাইনোভিয়াল সন্ধির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করবো-

১। সন্ধিস্থল ক্যাপসুল দ্বারা আবৃত এবং সন্ধি সৃষ্টিকারী অস্থিগুলো লিগামেন্ট দ্বারা সংযুক্ত।

২। অস্থিগুলোর প্রান্ড়দেশ কার্টিলেজ দ্বারা আবৃত।

3| এই সন্ধিতে একটা সন্ধি গহ্বর থাকে। এতে সাইনোভিয়াল ফ্লুইড নামে এক ধরনের পি”ছল তরল পদার্থ থাকে। এই তরল পদার্থ নাড়া চাড়ার সময় অস্থি বা কাটি লেজের মধ্যে ধর্ষণ প্রতিরোধ করে।

৪। সন্ধিস্থল সাইনোভিয়াল পর্দা দ্বারা আবৃত। শুধুমাত্র এ অস্থির আরটিকুলার সারফেস এবং আরটিকুলার কার্টিলেজ ব্যতীত।

৫। অস্থি সন্ধিতে অস্থিগুলো স্বছন্দে নড়াচড়া করতে পারে।

সাইনোভিয়াল সন্ধি বিভিন্ন প্রকারের হয়। যেমন-

১। হিন্জ জয়েন্ট বা কবজা সন্ধি (Hinge Joint): এই ধরনের অস্থি সন্ধিতে একটি অস্থির গোল প্রান্ড় অপর একটি অস্থির অর্ধবৃক্তাকার গর্তের খাঁজে যুক্ত থাকে। যেমন- এলবো জয়েন্ট, নী জয়েন্ট ইত্যাদি।

২। কিলক/পিভট জয়েন্ট (Pivot Joint): এই ধরনের অস্থি সন্ধিতে একটি লম্বা ধরনের অস্থিকে ঘিরে অপর একটি চক্রাকার অস্থি অবস্থান করে এবং এই লম্বাকার অস্থির চারিদিকে আবর্তিত হয়। যেমন ১ম ও ২য় কশের“কার সন্ধি।

৩। কনডাইলার জয়েন্ট (Condylar Joint): টেমপোরো মানডিবুলার জয়েন্ট।

৪। ইলিপ সয়েড জয়েন্ট: যেমন রেডিওয়াস ও কার্পালের সন্ধি।

ফাইব্রাস জয়েন্ট (Fibrous Joints):

এই সন্ধিতে সন্ধিগহ্বর থাকে না। এসব সন্ধির অস্থিগুলো চ্যাপ্টা এবং এদের কিনারগুলো বহুসংখ্যক ছোট-বড় খাঁজ বা সুচার (Suture) যুক্ত। পাশাপাশি অবস্থিত অস্থিগুলো সুচার বা খাঁজের সাহায্যে এমন ভাবে মিলে যায় যে অস্থিগুলোর মধ্যে কোন ফাঁকা থাকে না। এসব অস্থি সন্ধি অচল বা অত্যন্ড় কম সচল।

ফাইব্রাস অস্থি সন্ধি তিন ধরনের হয়। যেমন-

১। সুচার (Sutures): মাথার করোটির অস্থিগুলো মধ্যবর্তী অচল সন্ধি।

২। সিনডেস মোসিস (Syndesmosis) ইনফিরিয়র টিভিও ফিকুলার অল্প সচল অস্থি সন্ধি।

৩। গমফোসিস (Gomphosis) এই সন্ধি অচল। যেমন- দাঁত ও চোয়ালের মধ্যবর্তী অচল সন্ধি।

কার্টিলেজিনাস জয়েন্ট বা তর“নাস্থিময় অস্থি সন্ধি

এই সন্ধিতে তর ্নাস্থি বা কার্টিলেজ থাকে। এই সন্ধি সচল বা অল্প সচল।

এক দুই প্রকারের হয়। যেমন-

1| প্রাইমারী কার্টিলেজিনাস জয়েন্ট- দীর্ঘ অস্থি সমূহের এপিফাইসিস ও ডাইফাইসিসের অচল সন্ধি সমূহ।

২। সেকেন্ডারী কার্টিলেজিনাস জয়েন্ট- পিউবিক সিমফাইসিসের আংশিক সচল সন্ধি।

ইউনিট ২: হাত ও পায়ের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা

পাঠ ২.১ : উধ্বাংঙ্গের বোন বা অস্থি সমূহ

এই পাঠ শেষে আমরা উধ্বাংঙ্গের বোন বা অস্থি সমূহ জানতে পারব - -

উধ্বাংঙ্গের বোন বা অস্থি সমূহ নিম্নরূপ-

১। সোলডার গার ডেলের বোনস হল স্ফাপুলা এবং ক্লাভিকল।
২। আরম বা বাহুর বোনস হল হিউমারাস।
৩। ফোর আরম বা অগ্রবাহুর বোনস্ হল রেডিয়াস এবং আলনা।
৪। হাতের বোনসগুলির মধ্যে ।
৫। ৮টি কারপাল বোনস্
৬। ৫টি মেটারকারপাল বোনস্ এবং
৭। ১৪টি ফ্যালানজেনস থাকে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উধ্ববাহু বা আপার লিম্বের মোট বোন বা অস্থির সংখ্যা ৩২টি।

মানব শরীরের আপার লিম্বব বা উধ্ব বাহুতে কি কি বোন বা অস্থি থাকে। আপার লিম্ব বা উধ্বাংশ অস্থি বা বোন এবং বিভিন্ন ধরনের সফ্ট টিস্যু নিয়ে গঠিত। এখানে আমরা শুধু অস্থি বা বোন নিয়ে আলোচনা করব।

ক্লাভিকল নিয়ে-

ক্লাভিকল দেখিতে ইটালিক f এ মত বাকা।
এটি একটি লং বোন অর্থাৎ লম্বা অস্থি।
এর মিডিয়াল এবং লেটারাল দুটি প্রান্ড় আছে এবং একটি স্যাফ্ট বা বাহু আছে। এর মিডিয়াল প্রান্ড় সংযোগ করে স্টারনামের সাথে এর লেটারাল প্রান্ড় সংযোগ করে কাপুলার অ্যাকরোমিয়ান প্রসেসের সাথে।

স্ফাপুলা-

ইহা ক্লাভিকলের সাথে যুক্ত হয়ে সোলডার গারডেল তৈরী করে। স্ফাপুলা দেখিতে চাপা এবং ত্রিকোনাকার। এর দুটো সারফেস যেমন- কোসটাল এবং ডরসাল সারফেস এবং তিনটি বরডার যেমন- সুপিরিয়ার, মিডিয়াল এবং লেটেরাল এবং তিনটি আঙ্গেল- সুপিরিয়াল, ইনফিরিয়াল এবং লেটেরাল। স্ফাপুলার তিনটি প্রসেস আছে। যেমন- স্পাইন, অ্যাক্রোসিয়াম এবং কোরা কয়েড প্রসেস।

স্কাপুলার নিয়ে-

লেটারেল আঙ্গেল গি-নয়েড ক্যাভিটি একটা গহ্বর ধারন করে শুধুমাত্র হিউমারাসের হেডের অস্থি সন্ধির জন্যে। এবং এ দুটো সংযুক্ত হয়ে সোলডার জয়েন্ট তৈরী করে।

জয়েন্ট: ক্লাভিকলের দুই প্রান্ড় মানুব্রিয়াম ও অ্যাক্রোসিয়ামের সাথে যুক্ত হয়ে স্টারর্নো ক্লাভিকুলার (Sternoclvicalar) ও অ্যাক্রোমিত্ত ক্লাভিকুলার জয়েন্ট তৈরী করে।

(Sternoclavicular):- জয়েন্ট থাকায় ক্লাভিকল উপরে নীচে সামনে ও পিছনে সঞ্চালিত হতে পারে। এবং অ্যাক্রোমিও ক্লাভিকলের দ্বারা অস্থি সমুহের সামান্য সঞ্চালন ঘটে। উভয় সন্ধিই লিগামেন্ট দ্বারা আবদ্ধ।

এখন আমরা দেখব বাহুর অস্থিগুলি কি কি?

বাহুকে ৩টি অঞ্চলে ভাগ করা যায়। যেমন:-

১। উধ্ববাহু বা Arm
২। সম্মুখ বাহু বা Forearm
৩। হাত বা Hand

উর্ধ্ববাহুর অস্থি:

উধ্ববাহু হিউমারাস নামে একটি লম্বা, নলাকার অস্থি দ্বারা গঠিত। এর একটি শ্যাফট বা ডায়াফাইসিস এবং দুইটি প্রান্ড় বা এপিফাইসিস আছে। হিউমারাসের উর্ধ্বপ্রান্ড়ে হেড থাকে যাহা স্ফাপুলার সাথে যুক্ত থাকে। তা ছাড়া গ্রেটার টিউবারকল, লেছার টিউবারকল এবং অ্যানাটমিকাল নেক নামে একটি খাজ থাকে। শ্যাফট এবং অ্যাপার প্রান্ড়ের সংযোগস্থলে সার্জিকাল নেক থাকে।

শ্যাফটে রক্ত নালিকা ও স্নায়ু প্রবেশের ছিদ্র আছে। শ্যাফটের কিছু অংশ ডেলটয়েড পেশী আটকানোর জন্য খসখসে থাকে।

হিউমারাসের নিচের প্রান্ড়ে দুইটি কন্ডাইল থাকে। এই প্রান্ড়ে রেডিয়াম ও আলনার সংযোগী তল এবং করনয়েড ও ওলিক্রেনন ফোসা রয়েছে।

আবার হিউমারাসের নীচের প্রান্ড়কে এভাবে ভাগ করা হয়। যেমন-

- আরটি কুলার পার্টস- ক্রাপিটুলাম, ট্রকলিয়া
- নন আরটি কুলার পার্টস- মিডিয়াল ইপিকনডাইল, লেটারাল ইপিকনডাইল, করেনয়েন্ড ফোসা আলক্রনোন ফোসা।

সম্মুখ বাহুর অস্থির বা ফোর আরমস্

সম্মুখ বাহু দুটি লম্বা নলাকার অস্থি নিয়ে গঠিত। যথা- রেড়িয়াস ও আলনা এ দুটি অস্থি ঘন সংলগ্ন হইয়া অবস্থান করে।

রেডিয়াস ফোর আরমের বাম দিকে থাকে এবং এর দুটি প্রান্ড় এবং একটি শ্যাফট আছে। এর উর্ধ্ব প্রান্ড়ে হেড নেক ও টিউবার চিটি থাকে, এর শ্যাফটে তিনটি বর্ডার ও তিনটি সারফেস আছে।

রেডিয়াসের নীচের প্রান্ড় একটু চ্যাপ্টা। এই প্রান্ড়ে কারপাল বোনের সংযোগী তল ও একটি স্টাইলয়েড প্রসেস আছে।

আলনা-ফোর আরমের মিডিয়ালী থাকে। এর ও দুটি প্রান্ড় ও ১টি শ্যাফট আছে। আপার প্রান্ড় আলিক্রনন প্রসেস, করনয়েড প্রসেস, ট্রকলিয়ার নচ, রেডিয়াল নচ, ওটিডরার দুটি থাকে।

নীচের প্রান্ড়ে হেড ও স্টাইলয়েড প্রসেস থাকে।

কারপাল বোনস্ বা হাতের অস্থি:

হাতের অস্থি গুলি কার্পাল, মেটা কার্পাল ও ফ্যালাঞ্জেস-এ বিভক্ত।
Kvcv©j †evbm¸wj †hgb-

দুই সারিতে ৪টি করে মোট ৮টি ছোট ছোট কার্পাল অস্থি দ্বারা রিস্ট বা কব্জি গঠিত।

প্রথম সারিতে থাকে- লেটারাল টু মিডিয়াল

- স্কাফয়েড
- লুনেট
- টাইকুইট্রাল
- ফিজি ফর্ম

দ্বিতীয় সারিতে থাকে-

- ট্রাপিজিয়াম
- ট্রাপিঝয়েড
- ক্যাটিটেট
- হ্যামেট

মেটা কার্পাল বোনস্

মেটাকার্পাল অস্থির সংখ্যা মোট ৫টি। ইহারা লম্বা ও নলাকার একটি গোড়া শ্যাফট ও মাথা নিয়ে গঠিত। অস্থিগুলি হাতের করতল গঠন করে।

ফ্যালাঞ্জেস: আঙ্গুলের অস্থিগুলিকে ফ্যালানজস্ বলে। প্রত্যেক হাতে মোট ১৪টি থাকে। ইহা খাটো ও নলাকার। বৃদ্ধাঙ্গুলে ২টি এবং অন্য আঙ্গুলে ৩টি করে থাকে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা এতক্ষণ আমরা আপার লিম্বের বিভিন্ন বোন বা অস্থি নিয়ে আলোচনা করলাম–এরপরে আমরা লেসন ৩ এ দেখব জয়েন্ট অব দি আপার লিম্ব।

পাঠ ২.২ আপার লিম্বের জয়েন্ট

আপার লিম্বের জয়েন্টগুলি হল

- স্টারনোক্লাভিকুলার জয়েন্ট
- অ্যাক্রোমিইয়ো ক্লাভিকুলার জয়েন্ট
- সোলডার জয়েন্ট
- এলবো জয়েন্ট
- সুপিরিথর এন্ড ইন ফিরিয়র রেডিও আলনার জয়েন্ট
- ইন্টার কারপো মেটা কারপাল এন্ড ইন্টার মেটাকার্পাল জয়েন্ট
- মেটা কারপো ফ্যালাজিয়াল জয়েন্ট
- ইন্টার কারপো ফ্যালাজিয়াল জয়েন্ট

এতক্ষণ আমরা উধ্ববাহু বা সুপিরিয়র এক্সট্রিমিটির বিভিন্ন জয়েন্টের নাম জানলাম। এখন আমরা এর মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ জয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমেই আসা যাক- স্টারনো ক্লাভিকুলার জয়েন্ট সর্ম্পকে-

এটা গঠিত হয় ক্লাভিক্যালের স্টারনাল প্রান্ড়, স্টারনামের ক্লাভিকুলার নচ এবং প্রথম কোষ্টাল কার্টিলেজের আপার সারফেসে।

এটি সাইনোভিয়াল টাইপের জয়েন্ট। এরপরে অ্যাক্রোমিইয়ো ক্লাভিকুলার জয়েন্ট এটি গঠিত হয় ক্লাভিকলের ল্যাটারাল এন্ড এবং স্কাপুলার অ্যাক্রোমিয়ান প্রসেসের সমন্বয়ে।

এটি সাধারণ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট।

এর পরে আমরা আসব উধ্ব বাহুর সবচেয়ে গুর"ত্বপূর্ণ জয়েন্ট অর্থাৎ সোলডার জয়েন্টে।

এটি স্কাপুলার গি-নয়েড ক্যাভিটি সহিত হিউসারাসের হেডের সম্বন্ধেয় গঠিত।

এটি বল এবং সকেট টাইপ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট। এই জয়েন্টে দ্বারা বিভিন্ন প্রকার মুডমেন্ট সম্পন্ন হয়। যেমন-

- ফ্লেক্সশন
- এক্সটিনশন
- অ্যাবডাকশন
- অ্যাডাকশন

- রোটেশন
- সারকামডাকশন

এলবো জয়েন্টের কথা আমরা কম বেশী সবাই জানি। এই জয়েন্টের উপরের দিকে থাকে ক্যাপিটুলাম এবং ট্রকলিয়া অব হিউমারাস এবং নিচের দিকে থাকে রেডিয়াসের আপার সারফেস এবং আলনা ও হিউমারাসের ট্রকলিয়ার নচ।

এটি হিনজ্ টাইপ অব সাইনোভিয়াল জয়েন্ট।

মুডমেন্ট

ফ্লেক্সশন এবং এক্সটেনশন

শিক্ষার্থী বন্ধুরা সবশেষে আমরা হাতের কব্জি বা রিষ্ট জয়েন্ট সর্ম্পকে জানার চেষ্টা করব।

রিষ্ট জয়েন্ট এর উপরের দিকে থাকে রেডিয়াসের নীচের প্রান্ড়ের ইনফিরির সারফেস এবং রেডিও আলনার জয়েন্ট এর আরটি কুলার ডিষ্ক।

রিষ্ট জয়েন্ট এর নীচের দিকে থাকে- যথাক্রমে স্কাফয়েড, লুনেট এবং ট্রাইকুইট্রাল বোন।

এটা সাইনোভিয়াল টাইপ অব ইলিপসয়েড জয়েন্ট।

এর দ্বারা অনেক ধরনের মুভমেন্ট সংঘটিত হয়। যেমন-

- ফ্লেক্সশন
- এক্সটেনশন
- অ্যাবডাকশন
- অ্যাডাকশন
- সারকামডকেশন

ইউনিট ৩: পরিপাকতন্ত্র

পাঠ ৩.১: পরিপাকতন্ত্র - মুখ ও মুখগহবর, জিহবা, খাদ্যনালী, পাকস্থলী

এই পাঠ শেষে আমরা জানতে পারব -

- Digestive System কি?
- কি কি Parts নিয়ে Digestive System গঠিত? এবং
- বিভিন্ন প্রকার Parts এর অবস্থান কোথায় এবং এর কাজ কি?

Digestive System কি?

আমাদের গৃহিত খাদ্যদ্রব্য সরাসরি রক্তের সাথে মিশতে পারেনা এজন্য Body খাদ্যদ্রব্যকে Physically and chemically process করে Absorption উপযোগী করে এবং বাকিটা waste product (Stool) হিসেবে বের করে দেয়।সুতরাং যে system-এর মাধ্যমে খাদ্য গ্রহন,পরিপাক শোষন অর্থাৎ ingestion, digestion,absorption and unabsorbale অংশ waste product হিসেবে বের করে দেয়। তাকে **Digestive System বলে**। Digestive system deals with the reception of food and preperation of it for assimilation by the body.

The digestive system used in human body for the process of digestion.The human digestive system is a complex series of organs and glands.

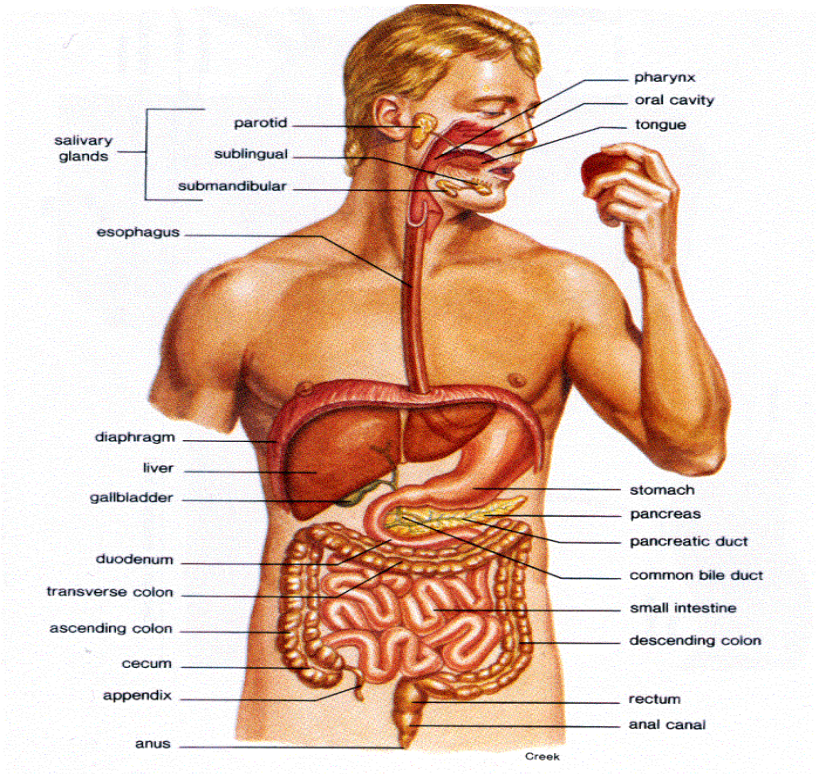

মানবদেহের digestive system এর একটি পরিপূর্ণ চিত্র

এখন আমরা Digestive System –এর Anatomy নিয়ে আলোচনা করব।

Digestive tract and digestive glands নিয়ে Digestive System গঠিত।

Digestive system is essentially long twisting tube that runs froms the mouth to the anus, plus a few other organs, like liver and pancreas, that produce or store digestive chemicals. The digestive tube begins at the lips and ends at the anus – একে সংক্ষেপে Digestive tract/Gastrointestrnal tract (G.I) বলে।**অর্থাৎ** Digestive tract মুখ থেকে anus পর্যন্ড় বিস্তৃত একটি প্যাচানো নালী বিশেষ।

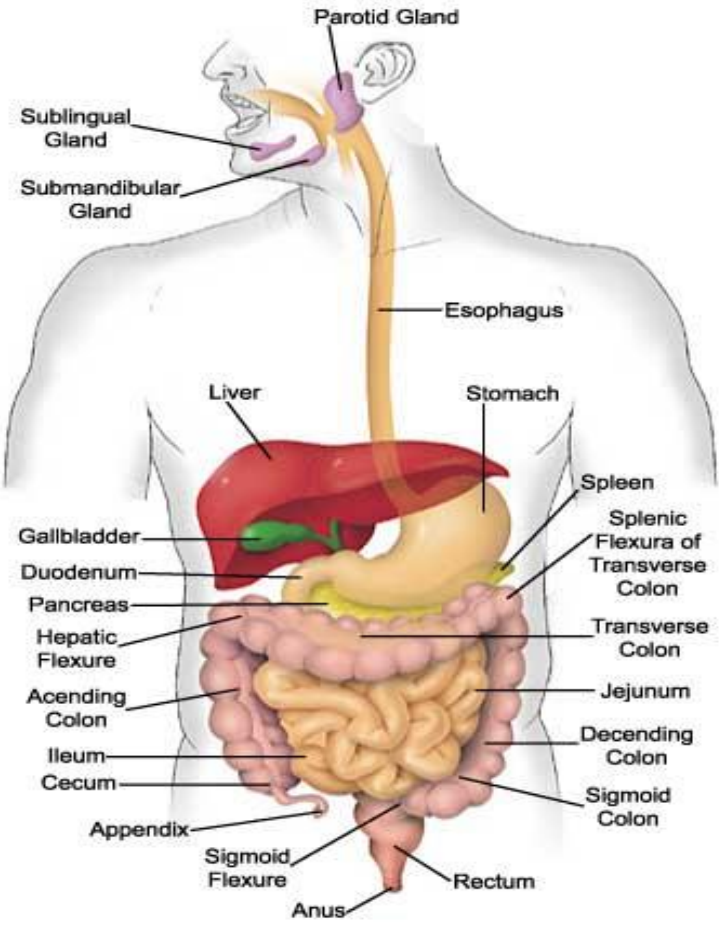

<u>Component of Digestive tract</u>:

1. Mouth/oral cavity with its teeth (for grinding the food).
2. Tongue (food mix with saliva)
3. Pharynx

4. Oesophagues
5. Stomach

6. Small intestine
    (a) Duodenum
    (b) Jejunum
    (c) Ileum
7. Large intestine
    (a) Caceum (Close ended sac connecting with ileum)
    (b) Ascending colon
    (c) Transverse colen
    (d) Descending colon
    (e) Sigmoid colon
8. Rectum
9. Anal Canal

আমরা আগেই জেনেছি যে, Digestion প্রক্রিয়ায় Digestive tract এর সাথে কিছু Organ বা gland কাজ করে সেগুলি হ'ল -

Digestive tract associated organs:

1. Salivary gland.
    - Parotid gland- lies on one each side, below and slightly infront of the ear.
    - Sub mandibular gland- lies on one each side, beneath the jaw bone.
    - Sub lingual grand- lies on one each side, beneath the tongue.
2. Liver
3. Pancreas
4. Gall bladder

G. I. এর Importance কি?

Firstly G. I. tract এর কাজ কি?

1. The movement of food by peristalsis
2. Secretion of digestive juice through the tract
3. Digestion of the foods by digestive juice
4. Absorption of the digestive and other essential products

Main Functions of digestive tract

1. Ingestion of food.
2. Digestion of food.
3. Secretion of various digestive juice
4. Absorption of H_2O, vitamins, salt and end product, of digestion.
5. Excretion of heavy metals and toxin etc.
6. Helps in movements of food through it.
7. Regulation of blood sugar level.
8. Regulation of water balance.

এখন পর্যায়ক্রমে আমরা digestive tract এর বিভিন্ন parts এর অবস্থান এবং কাজ সম্পর্কে ধারনা নেয়ার চেষ্টা করব।

Mouth

The digestive process begins in the mouth. Mouth contain teeth which masticate the food is partly broken down by the process of chewing and by the chemical action of salivary enzymes (these enzymes are produced by the salivary glands and break down starches into smaller molecules). Floor of mouth is muscular tongue. Tongue which assists in taste and swallowing.

Pharynx

Pharynx is a cone shaped musculomembranous passage behind the nose, mouth and larynx. Extends from base of skull to cervical six. Anterior wall communicate with nose, mouth and larynx and posterior wall is continuous with esophagus. It is about 12.5 cm long and divided into three parts a) nasopharynx b) oropharynx c) laryngopharynx.

pharynx এর মাধ্যমে খাদ্যবস্তু mouth থেকে o**esophagus** এ যায়।

Esophagus:

Esophagus is a long muscular tube that runs from the mouth to the stomach. It is 23-25 cm long rhythmic, wave-like muscle movements (called peristalsis) to force food from the throat into the stomach. It lies behind the

trachea. Passing through the thorax, it piceres the diaphragm to enter abdomen where it communicates with the stomach.

Esophagus peristalsis এর মাধ্যমে খাদ্যবস্তু পাকস্থলিতে প্রবেশ করতে সাহায্য করে।

Stomach

Stomach is a muscular bag. It is the most dilated part of the digestive tube. It is connected above to the lower end of the oesphagus and below to the duodenum. It consists of three parts – fundus, body and pyloric part. It is lined by peritoneum. It lies in the left hypocondrial and epigastric region of the abdomen. It is roughly "J" shaped, when it empties.

It has two opening, two borders (curvatures) and two surfaces.

The lower end of stomach is continues with the duodenum at the level of the lower border at vertebra L1 (transplyloric plane).

FUNCTION

1. It acts as reservoir for swallowed food and drink.
2. It begins the digestion of protein.
3. It helps to breakdown food and mixes it with secretion.
4. Gastric juice plays an important role in the digestion of food.
5. HCI destroy many organisms present in the food and drink.

THE SMALL INTESTINE

stomach এর pyloric end থেকে large intestine পর্যন্ড় সর‍ নলাকার অংশটি Small intestine 6-7 মিটার লম্বা এ নালিটি abdomen এর ভিতরে প্যাচানো অবস্থায় থাকে। অর্থাৎ it lies in the umbilical region of the abdomen and is surrounded by the large intestine.

Small intestine কে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয় - যেমনঃ

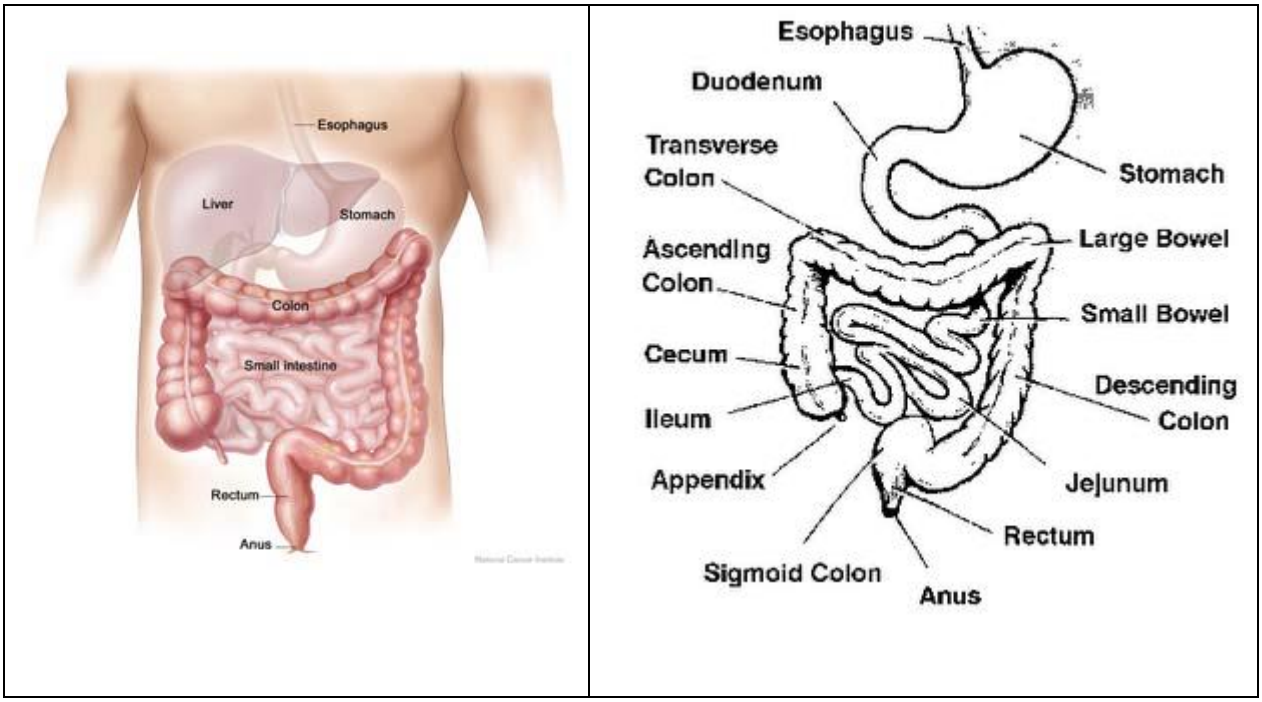

1. THE DUODENUM

The duodenum is the first 25cm of small intestine. It is the proximal dilated and fixed part of the small intestine, and is devoid of mesentery. It describes a C-shaped curve which encloses the head of the pancreas, and is subdivided into four parts.

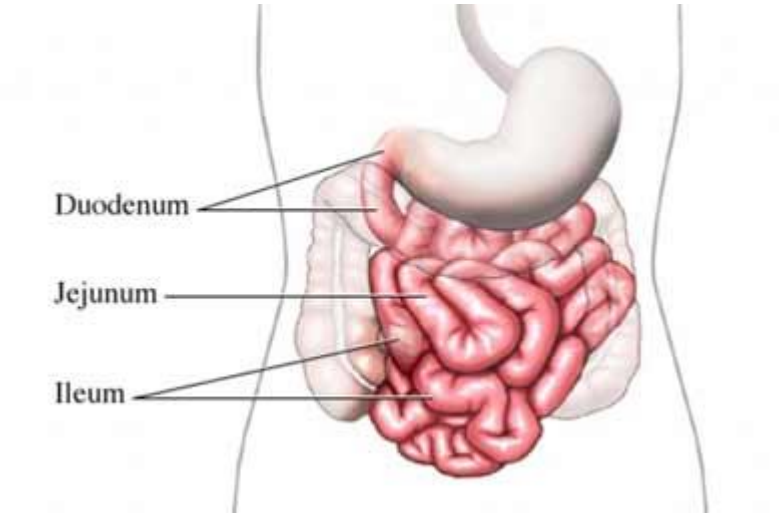

- *First or upper part – 5cm.*

- *Second or vertical part – 8 to 10 cm.*
- *Third or horizontal part – 10 cm.*
- *Fourth or ascending part – 2.5 cm.*

2. THE JEJUNUM AND ILEUM

The mobile part of small intestine extends from the duodeno-jejunal flexure to the ileo-caecal junction, and is arranged in a series of coils which are suspended from the posterior abdominal wall by the mesentery. The coils are contained within the three and half-sided framework of the large gut. Proximal $2/5^{th}$ of the small gut forms the jejunum and distal $3/5^{th}$ is known as the ileum. Beginning of jejunum and the ending of ileum are parallel to each other.

In the small intestine – After being in the stomach, food enters the duodenum, the first part of the small intestine. It then enters the jejunum and then the ileum (the final part of the small intestine). In the small intestine, bile (produced in the liver and stored in the gall bladder), pancreatic enzymes, and other digestive enzymes produced by the inner wall of the small intestine help in the breakdown of food.

The small intestine extends from the pyloric end of the stomach to the ileo-caecal junction. It consists of the proximal fixed part, the duodenum, and the remaining mobile part which includes the jejunum and the ileum. The total leagth of the small intestine is about 8 feet/2.5 metres in life and 6 m in death. The small intestine is essential for life, because most of the digestion and absorption takes place in the small intestine.

THE LARGE INTESTINE

After passing through the small intestine, food passes into the large intestine. In the large intestine, some of the water and electrolytes (chemicals like sodium) are removed from the food. Many microbes (bacteria like Bacterodes, Lactobacillus acidophilus, Escherichia coli, and Klebsiella) in

the large intestine help in the digestion process. The first part of the large intestine is called the cecum (the appendix is connected to the cecum). Food then travels upward in the ascending colon. The food travels across the abdomen in the transverse colon, goes back down the other side of the body in the descending colon, and then through the sigmoid colon.

The large intestine extends from the ileocaecal junction to the muco-cutaneous junction of the anal canal (pectinate line). It is about 1.5 metres or 6 feet long.

Large intestine এর অনেক bacteria, micro organism থাকে, যা Digestion process এ সাহায্য করে। Large intestine আবার কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম অংশ ই হলো সিকাম, সিকামের সাথে appendix থাকে।

Sub-divisions

The large intestine consists of four parts:

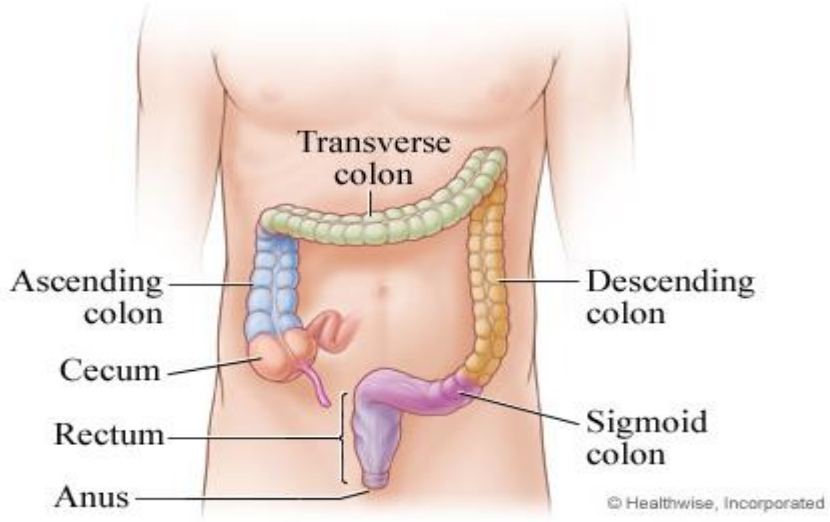

1. Caecum and appendix

Caecum – 6 cm. long. এর সাথে Appendix থাকে

Appendix – 2 cm.

2. Colon

Ascending -15 cm. long

Transverse – 25 cm. long

Descending – 25 cm. long

Sigmoid – 40 cm. long

3. Rectum -12-13 cm.

4. Anal canal – 3.8-4 cm.

THE CAECUM

The caecum is a blind-ended sac that project downwards in the right illiac region.The caecum is the commencement of large gut. It usually lies in the right iliac fossa. Size- Length – 6cm., Breadth – 7.5 cm.

THE VERMIFORM APPENDIX

It is a narrow worm-like tubular diverticulum which arises from the postero-medial wall of the caecum about 2 cm. below the ileo-caecal junction. It is coiled like a worm and is named the vermiform.

THE COLON

The colon consists of the following parts in succession – ascending, transverse, descending and sigmoid.

ASCENDING COLON

It is about 15 cm. long and 5 cm. In caliber. It extends upwards as a continuation of the caecum from the transtubercular plane to the right colic flexure, where it turns to the left side and is continuous with the transverse colon.

It extends across the abdominal cavity from the right colic to left colic flexures.

TRANSVERSE COLON

The transverse colon crosses the abdomen in the umbilical region from the right colic flexure to the left colic flexure. It is about 25 cm. long.

DESCENDING COLON

It extends from the left colic flexure to the left pelvic brim, and is about 25cm. long and 3.5cm. in caliber.

SIGMOLD COLON

As continuation of descending colon and ends at the recto-sigmoid junction in front of the third sacral vertebra.

Length (average) – 40cm. (16")

Breadth length – 5"

Maximum length -3.5"

THE RECTUM

Rectum is the lower dilated part of the large intestine and is contained in the pelvic cavity.

Length – 12cm.

Breadth – Upper part, 4 cm. lower part forms a dilatation, known as the ampulla.

FUNCTIONS OF LARGE INTESTINE

The unabsorbed residues of food are delivered from the small intestine into the caecum in a fluid state. By the time the contents reach the descending colon the semisolid consistency of faeces is formed. The faeces are usually stored in the descending and sigmoid colon, and are voided through the rectum and anal canal only during defaecation.

The mucous membrane of the large gut allows absorption of about 500 ml. of water per day with some crystalloids. The digestion of cellulose takes place in large gut with the help of putrefacitive bacteria which are the

normal contents of the gut. These bacteria help in the synthesis of vitamin B complex and vit. K.

THE ANAL CANAL

The end of the process – Solid waste is then stored in the rectum until it is excreted via the anus.

It begins at the ano-rectal junction where rectal ampulla suddenly becomes narrow, and the junction is situated about 2 to 3 cm. in front and slightly below the tip of the coccyx. From the ano-ectal junction the canal passed downwards and backwards through the pelvic diaphragm, and opens at the anal orifice which is situated in the cleft between the buttocks about 4 cm. below and in front of the tip of the coccyx

LIVER

The liver is the largest gland in the body. Situated in the upper right quadrant of the abdominal cavity. The liver is solid mass, raddish, brown in color soft in consistency. It is very friable. It weights about 1500gm, and varies from male to female.

The liver lie under diaphragm occupies the whole of the right hypochondrium, epigastric region of the abdomen and extents to the left hypochondrium upto mid - clavicular line.

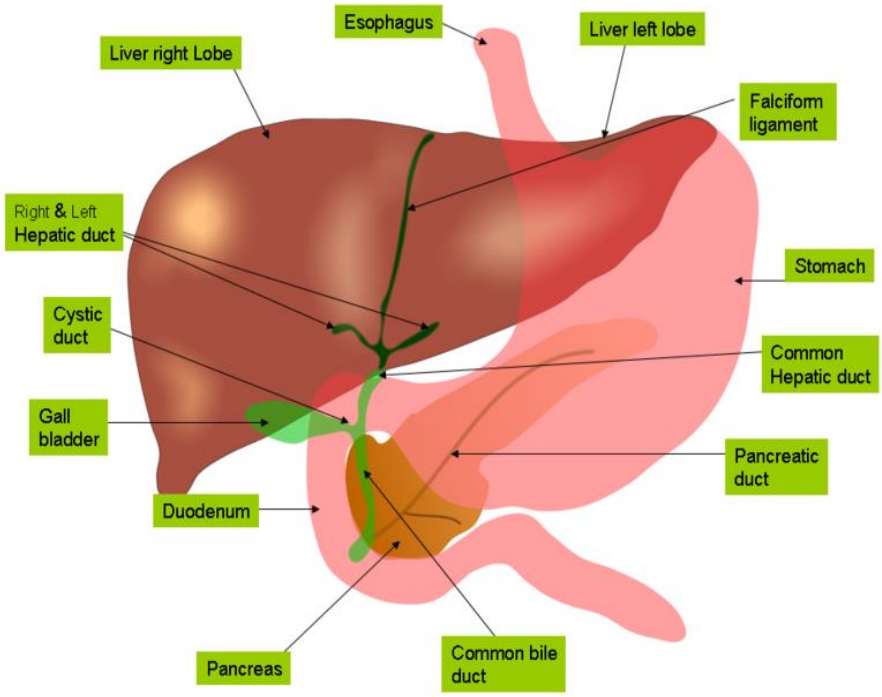

Fig.: Showing different parts of the liver.

The liver is divided into two lobes which are right and left lobe. The right lobe is larger than left lobe. By the presence of gall bladder the right lobe is further divided in a quadrate lobe and caudate lobe.

Function of Liver

1. Production and secretion of bile.
2. Metabolism of carbohydrate, fats and proteins.
3. Filtration of the blood removing bacteria and foreign particle.

4. Excretion of drugs, toxins, poisons, bile pigments, cholesterol etc.
5. Storage of glycogen, iron, fat, vitamin A, D and blood.

THE GALL BLADDER

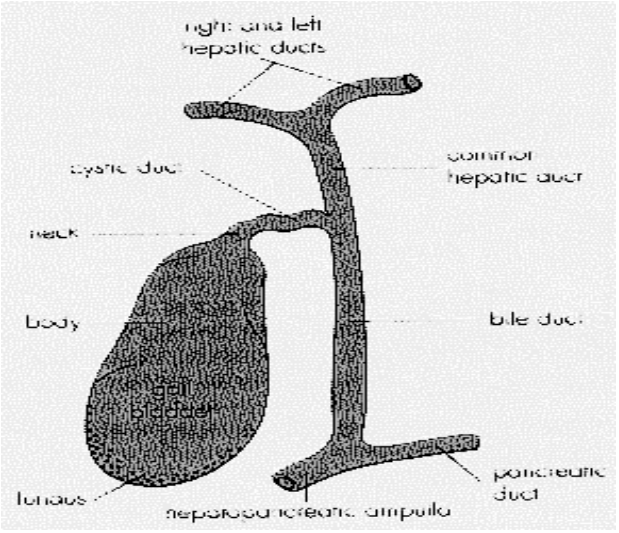

Fig.: Showing different parts of the gall bladder.

The gall - bladder is a pear - shaped, musculo- membranous bag, slate blue in color which is reservoir of bile. It is situated in a fossa on the inferior surface of the right lobe of the liver.

It is 7 to 10 cm (3 to 4 in) long, 3 cm broad at its widest part and its, capacity about 30 -60 ml.

It is divided into -

1. the fundus
2. the body
3. the neck.

*[**Cystic Duct:** is about 1 ½ inch (4cm) in length and passes from the neck of the gall bladder and joints the hepatic duct. to form bile duct. It convey the bile to the duodenum]*

Functions of Gall Bladder

1. Act as a reservoir for bile.
2. Absorption of water and concentration bile.

3. Absorbs small amount of a loose bile salt, cholesterol compound.
4. When food rich in fat enters in to duodenum. Then the gall bladder contacts to liberate a hormone- cholecystokinin-Pancreozymin and helps digestion.

Surface Anatomy- The gall bladder projects slightly from the costal margin at the level of the 9^{th} right costal cartilage.

Applied Anatomy

Cholecytitis -Inflammation of the gall bladder is called cholecyititis.

Murphy's Sign- When a finger is placed just below the costal margin, at the tip of the 9^{th} costal cartilage, the patient feels sharp pain on inspiration. This is called Murphy's sign.

Cholelithiasis- Stone is gall bladder.

Pancreas

Pancreas is a soft lobulated organ. It is situated behind the stomach and it extends from the duodenum to the spleen.

ইউনিট ৪: রেচনতন্ত্র

পাঠ ৪.১: **রেচনতন্ত্র এর গঠন**

প্রথমেই আমরা আজকের পাঠের উদ্দেশ্য সমূহ জেনে নেই, এই পাঠ শেষে আমরা জানতে পারবো-

- Urinary System কি?
- কি কি Parts নিয়ে Urinary System গঠিত? এবং
- বিভিন্ন প্রকার Parts এর অবস্থান কোথায় এবং এর কাজ কি?

মানবদেহের স্বাভাবিক Physiological কার্যাবলী পরিচালনার জন্য কোষের ভিতরে নানা ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয় এবং আমিষ জাতীয় খাদ্য বিপাকের ফলে সৃষ্ট হয় নাইট্রোজেন জাতীয় বর্জ্য পদার্থ। এই বর্জ্য পদার্থ রক্তের সাথে পরিবাহিত হয়ে Kidney তে পৌঁছে এবং বিশেষ প্রক্রিয়ায় রক্ত থেকে এসব বর্জ্য অপসারিত হয়, ফলে রক্ত পরিশোধিত হয় এবং রক্ত হতে পরিশোধিত তরল ও অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ মিলে Urine তৈরী হয়। রেচন বা excretion প্রকৃতপক্ষে রক্ত থেকে Urine জাতীয় বর্জ্য পদার্থ পরিশোধন করার বিশেষ পদ্ধতি। Kidney ই মানুষের প্রধান excretory বা urinary অঙ্গ।

তাহলে আমরা প্রথমেই জানতে চেষ্টা করি Excretion/রেচন কি?

Exeretion can be defined as the removal of toxic waste products of metabolism from the body. এবং যে **System** এর মাধ্যমে toxic waste products অর্থ্যাৎ Urine নিষ্কাশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাকে Urinary System/Excretory System বলে।

Urinary System নিম্নলিখিত organ নিয়ে গঠিত -

<u>Component of Urinary system</u>:

1. A pair of kidneys: Form urine.
2. A pair of ureters: Convey urine from kidney to bladder.
3. A urinary bladder: Temporary reserviours of urine.
4. Urethra: Excrete urine from bladder to the exterior.

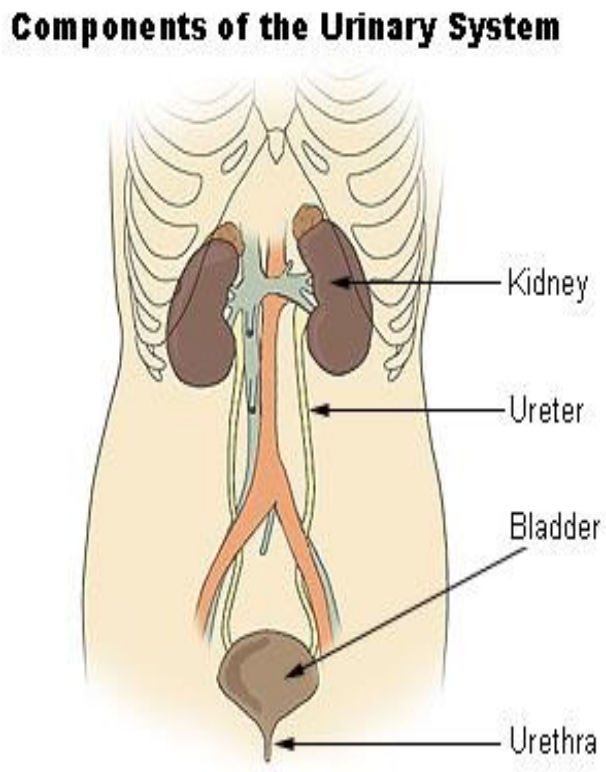

Components of the Urinary System

এখানে আমরা মানবদেহের urinary system এর একটি পরিপূর্ণ চিত্র দেখতে পাচ্ছি।
এখন আমরা Urinary System –এর Anatomy নিয়ে আলোচনা করব। আমরা পর্যায়ক্রমে Urinary System –এর বিভিন্ন organ সম্পর্কে বিস্ড়ারিত জানব।

এ পর্যায়ে প্রথমে আমরা _Kidneyর Anatomy সম্পর্কে জানব।

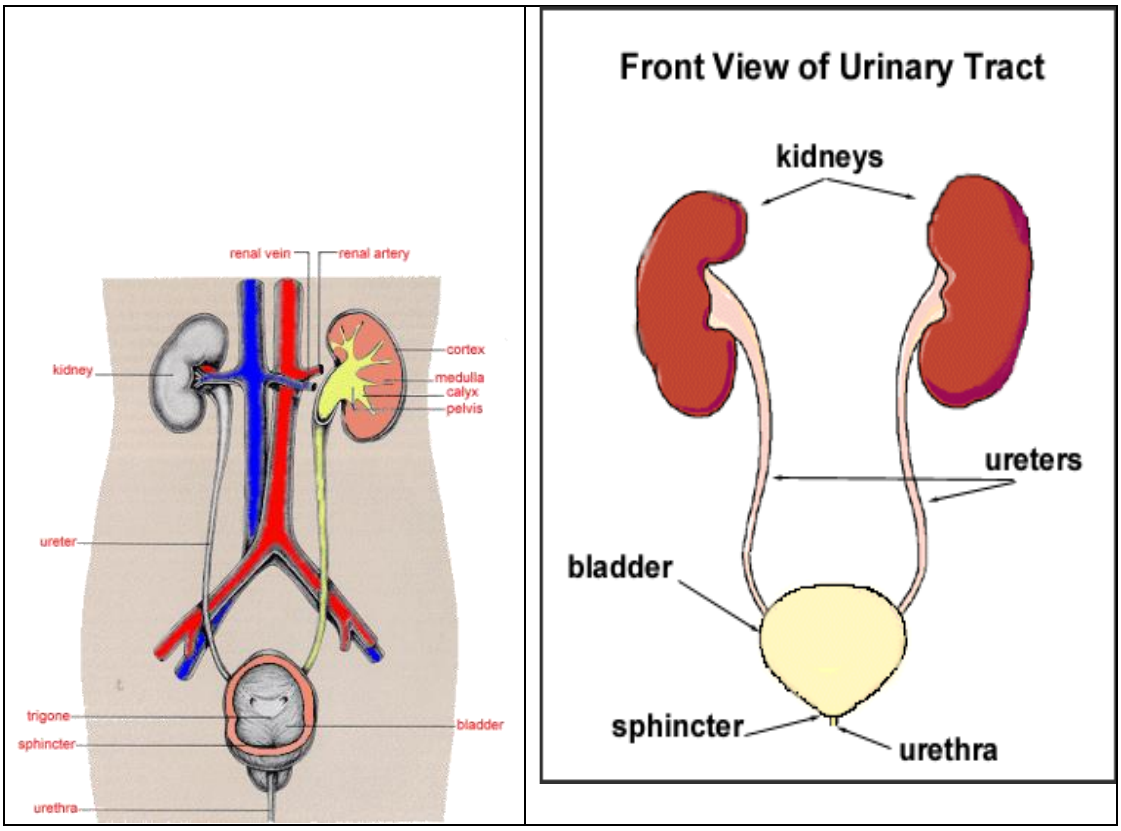

আমরা জানি, মানুষের প্রধান excretory অঙ্গের নাম **kidney**। Abdomen পিছনের দিকে মেরুদন্ডের দুপাশে একটি করে মোট দুটি **kidney** অবস্থিত। প্রতিটি **kidney** সীমের বিচির মত আকৃতি বিশিষ্ট। এদের রং খয়েরী লাল। পূর্ণবয়স্ক মানুষের প্রতিটি **kidney** লম্বায় প্রায় ১১-১২ সেন্টিমিটার, প্রস্থে ৫-৬ সেন্টিমিটার এবং ৩ সেন্টিমিটার পুরু। **kidney**র বাইরের দিক convex এবং ভিতরের দিক concave।

বাম দিকের **kidney** ডান **kidney** অপেক্ষা কিছুটা উপরের অবস্থান করে। প্রতিটা **kidney** যোজক টিস্যু দ্বারা গঠিত পেরিটোনিয়াম পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে। ফলে দেহ গহবরে অবস্থান করলেও প্রতিটা **kidney** দেহগহবর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। প্রতিটা kidneyর অগ্রপ্রান্তে adrenal gland টুপির মত অবস্থান করে। **kidneyর** ভিতরের দিকের concave ফাঁকা গর্তের মত ভাঁজটাকে renal sinus বলে।

Renal sinus-এ অবস্থিত kidneyর সম্পূর্ণ অংশ সমূহসহকে hilum বলে। Hilum এর মধ্য দিয়েই kidneyর artery, vein, nerve ইত্যাদি kidney অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। আবার hilum মধ্য দিয়েই kidneyর artery, vein, nerve এবং ureter kidney থেকে বের হয়ে আসে। Hilum এর নিকটবর্তী ureterর প্রথম ও প্রশস্ত অংশকে pelvis বলে।

লম্বচ্ছেদ করলে kidneyকে দুটো অংশে বিভক্ত করা যায়। যথা:

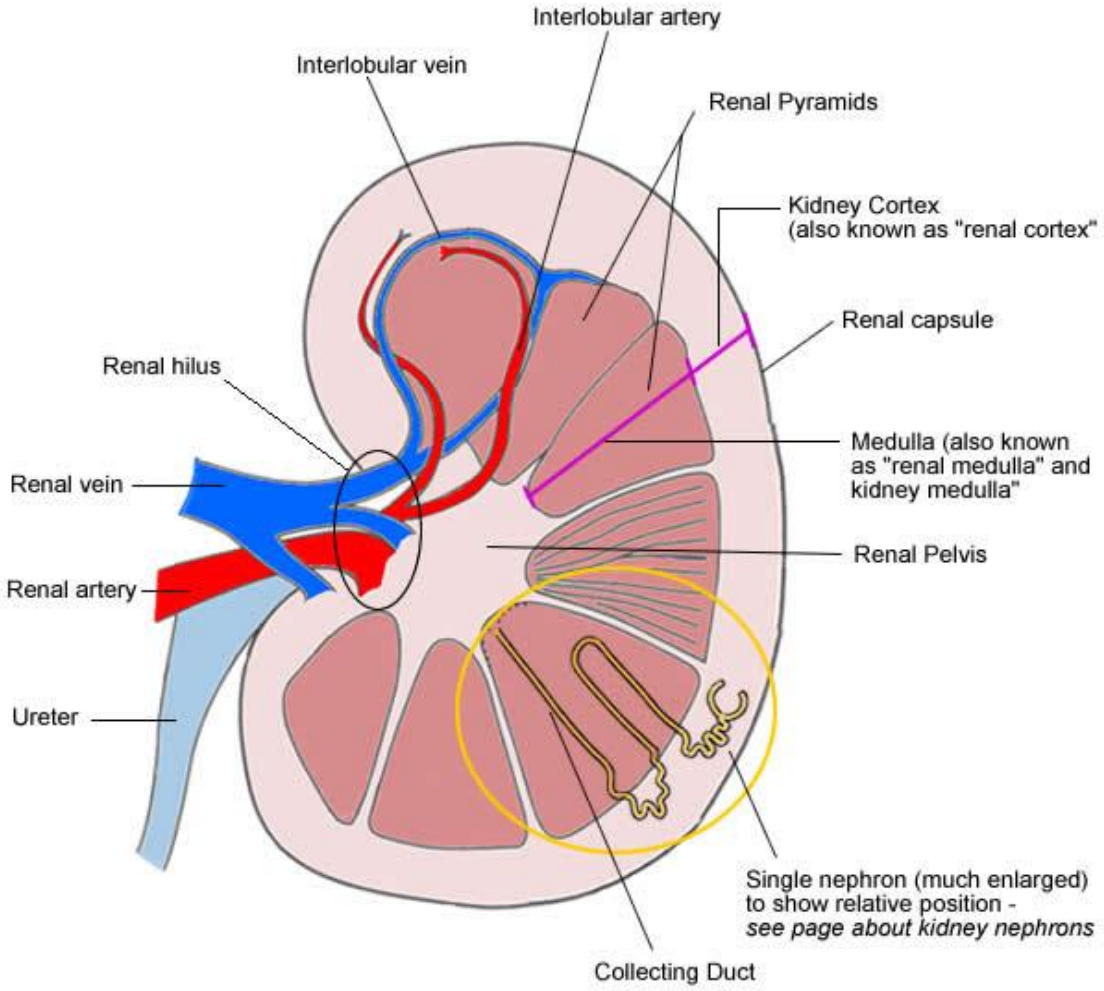

ক) বাইরের দিকে Renal cortex ঃ Renal corlex is the outer part of the kidney and has a reddish colour. Renal cortex-এ ইউরিনিফেরাস্ নালিকার Bowman's capsule এর অংশ এবং Glomerulus অবস্থান করে।

খ) ভিতরের দিকে medulla ঃ Renal medulla is the inner part of the kidney. Renal medullaতে নেফরণের Loop of Henle with descending & ascending limbs, Distal convoluted tubule, Collecting tubule, Collecting duct ইত্যাদি অবস্থান করে।

cortexর বাইরের দিকের তন্ড়ময় আবরণকে Renal capsule বলে। Renal Capsule- হল স্বচ্ছ্ব মসৃন রেডিস কালারের পর্দার মত যা kidney বাইরের দিকে আবৃত করে রাখে এবং kidney কে আঘাত থেকে রক্ষা করে

cortex হালকা রঙের এবং medulla গাঢ় এবং কিছুটা কালচে রঙের হয়। medullaতে কয়েকটা মোচাকৃতি খন্ডাংশ থাকে। এদেরকে পিরামিড বলে। প্রায় ৫-১৮টি Renal Pyramid থাকে

পিরামিডগুলো ক্যালিক্স নামে কতগুলি জালিতে প্রসারিত হয়। ক্যালিক্সগুলো pelvis উন্মুক্ত হয়। pelvis এরপর ureter-এ open হয়। Renal Pelvis ফানেল আকৃতির অনেকটা বেসিনের মত যেখানে kidneyর Nephron থেকে Urine এসে জমা হয়।

এখন আমরা kidney সবচেয়ে গুররুত্বপূর্ণ অংশ Nephron নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

প্রথমেই আমরা জানব, What is Nephron?

Definition: Nephron is the structural & functional unit of kidney. অর্থ্যাৎ kidneyর গঠনমূলক ও কার্যকরী একক হলো nephron ।

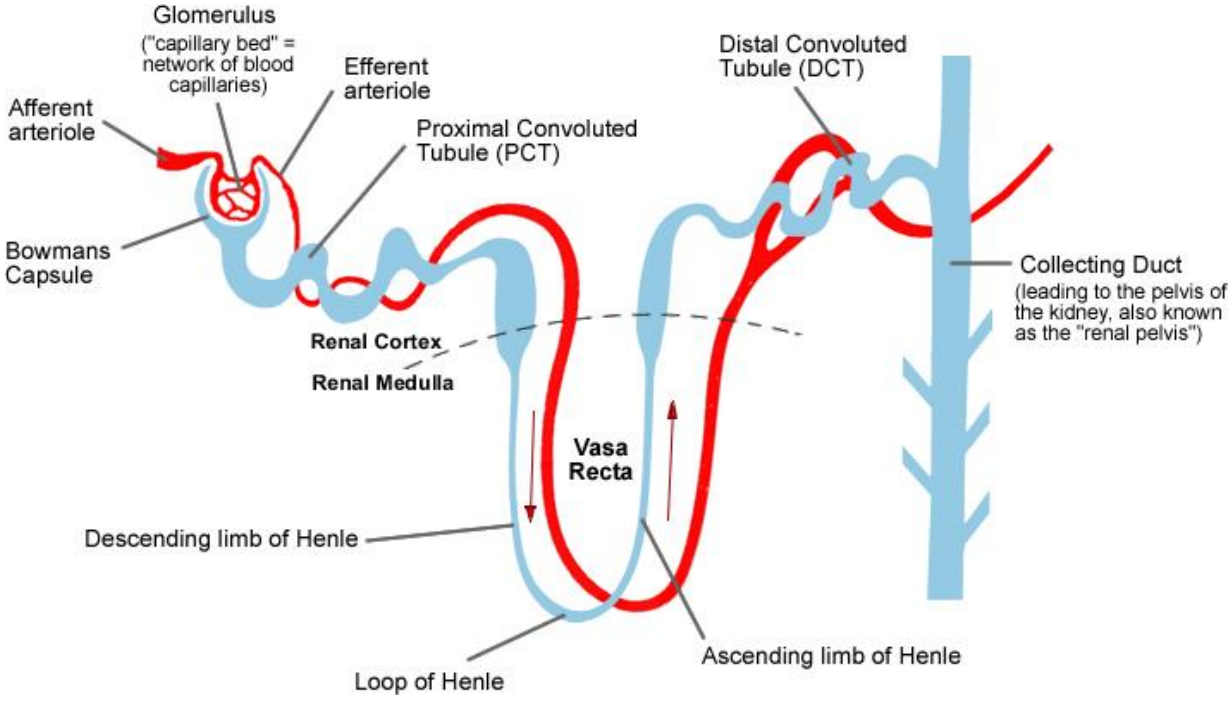

Nephron গঠন ঃ প্রতিটি nephron দুটো অংশ আছে। যথা-

A) Renal corpuscle: It includes

- ❑ Glomerulus &
- ❑ Bowman's capsule.

B) Renal tubule : Each renal tubule consists of

- ❑ Proximal convoluted tubule
- ❑ Loop of Henle with descending & ascending limbs.
- ❑ Distal convoluted tubule
- ❑ Collecting tubule
- ❑ Collecting duct.

প্রতিটি kidney অভ্যন্ড়রে প্রায় 1 Million- nephron থাকে। nephron এর মাধ্যমে urine উৎপন্ন হয়। রক্ত থেকে ছাঁকন পদ্ধতিতে (রক্ত কোষ ব্যতীত) নাইট্রোজেনযুক্ত বর্জ্য পদার্থ ও অন্যান্য পদার্থ নেফরণের Bowman's capsule গহবরে প্রবেশ করে, অর্থ্যাৎ এখানেই রক্ত থেকে নাইট্রোজেন যুক্ত বর্জ্য পদার্থ অপসারিত হয়ে রক্তের পরিশোধন ঘটে এবং urine উৎপন্ন হয়।

ক) Bowman's capsule ঃ Nephronর সামনের অংশ। প্রতিটি Bowman's capsule স্কোয়ামাস Cell দ্বারা তৈরী দ্বিস্ড়র প্রাচীর বিশিষ্ট গোলাকার কাপের মত একটি অঙ্গ। এ কাপের মধ্যে glomerulus নামে রক্তনালীর একটি গুচ্ছ অবস্থান করে। Renal arteryর একটি afferent branch পৃথকভাবে Bowman's capsule মধ্যে প্রবেশ করে এবং glomerulus বা কৈশিকনালীতে বিভক্ত হয়। এ কৈশিকনালী মধ্যকার রক্তের মধ্যে নাইট্রোজেনযুক্ত বর্জ্যপদার্থ বা urine উপাদান থাকে। Glomerulus এর ভিতরের রক্ত থেকে (উচ্চ চাপের দরুণ এবং efferent রক্তনালীগুলো তুলনামূলকভাবে অধিকতর সরু হওয়ায়) নাইট্রোজেনযুক্ত বর্জ্যপদার্থ bowman's capsule পাতলা প্রাচীর বিশিষ্ট কোষের মাধ্যমে ছাঁকন পদ্ধতিতে bowman's capsule গহবরে প্রবেশ করে এবং পরিশোধিত রক্ত efferent artery মাধ্যমে bowman's capsule গহবর থেকে বের হয়ে যায়।

খ) **Renal tubule** ঃ Nephronর পিছনের অংশ। Bowman's capsule পরবর্তী নালিকাকার অংশকে Renal tubule বলে। এ নালীর মধ্যে দিয়ে urine সংগ্রাহক নালীর মাধ্যমে প্রথমে Duct of Belliniতে যায় ও পরে Duct of Bellini থেকে পেলভিসের দিকে প্রবাহিত হয়। এ সময় Renal tubule প্রাচীরের কোষসমূহ প্রয়োজনীয় পানি ও অন্যান্য পদার্থ পুনঃশোষণ করে নেয়।

Renal tubule কে আবার ৩টি অংশে ভাগ করা হয়। যেমনঃ

1. Proximal convoluted tubule with descending Limbs
2. Loop of Henley
3. Distal convoluted tubule or ascending limbs

Proximal convoluted tubule with descending limbs - এটি Bowman's capsule এর পরবর্তী প্যাঁচানো অংশ।

Loop of Henley - এটি Nephron এর নালিকার মধ্যবর্তী অংশ। Loop of Henley আকৃতি অনেকটা U-এর মতো। এটা পুনাশোষনের অঞ্চল বৃদ্ধি করে।

Distal convoluted tubule or ascending limbs- এটি Loop of Henley এর পরবর্তী অংশ। এটা পরবর্তীতে Collecting tubule এ যুক্ত হয়। প্রতিটি kidneyতে বেশ কিছু সংখ্যক Collecting tubule থাকে। পরবর্তীতে এসব Collecting tubule মিলিত হয়ে Duct of Bellini নামে একটি করে সাধারণ নালী গঠিত হয়। এবং পরে Duct of Bellini মিলিত হয়ে ureter গঠন করে এবং kidney থেকে বের হয়ে যায়।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমরা জানব মানবদেহে **kidney** কি কাজ করে?

kidney প্রধান কাজগুলি হলো ঃ

ক) kidney দেহ তথা রক্ত থেকে নাইট্রোজেন গঠিত বর্জ্য পদার্থ বা রেচন পদার্থ অপসারণ করে।
খ) রক্তে অম্--ক্ষারের সমতা রক্ষা করে
গ) দেহের রক্ত চাপ নিয়ন্ত্রণ করে
ঘ) দেহে পানির সমতা রক্ষা করে
ঙ) পরোক্ষভাবে দেহের তাপমাত্রা রক্ষা করে
চ) ভিটামিন ডি-এর কার্যকরী রূপ তৈরীতে অংশ নেয়
ছ) লোহিত কনিকা তৈরীতে ভূমিকা রাখে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা ,এখন আমরা জানতে চেষ্টা করব Ureter সম্পর্কে -

Ureter

প্রতিটি kidneyর ভিতরের দিক থেকে একটা করে নালী বের হয়ে তির্যকভাবে urinary bladderর পিছনের প্রান্ড় দিয়ে urinary bladderর গহবরে উন্মুক্ত হয়। এ নালী প্রায় ২৫-৩০ সেন্টিমিটার লম্বা। kidneyর সংযুক্ত অংশে রেচন নালীর অংশ বেশ কিছুটা প্রশস্ড়। এ অঞ্চলকে পেলভিস বলে। ইউরেটরের মাধ্যমে kidney থেকে urine সংগৃহীত হয়ে urinary bladder-এ জমা হয়।
কাজ ঃ ইউরেটার kidney থেকে urinary bladder-এ urine পরিবহন করে।

Urinary bladder

Bladder is located anterior to the rectum (in male) and in female infront of uterus and upper vagina.
Urinary bladder একটি ত্রিকোণাকৃতি থলির মত অঙ্গ। urinary bladder পেশীগুলো অনৈচ্ছিক। এ থলি সংকোচন প্রসারণশীল পেশী দ্বারা গঠিত ও পাতলা প্রাচীর বিশিষ্ট। urinary bladder -Pelvic cavity ভিতরের অবস্থান করে। এ থলিতে urine জমা হয়। urinary bladder সাধারণত ৭০০-৭৫০ মিলিলিটার urine ধারন করতে পারে। কিন্তু ২৮০-৩২০ মিলিলিটারের চেয়ে বেশি urine, urinary bladderএ জমা হলে মানুষের urine ত্যাগের ইচ্ছা হয় এবং মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে urine ত্যাগ করে।

Urethra

Urethra,- male person এর ক্ষেত্রে urinary bladder পশ্চাৎ প্রান্ড় থেকে একটা নালী উৎপন্ন হয়ে লিঙ্গের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে লিঙ্গের অগ্রপ্রান্ড় পর্যন্ড় অগ্রসর হয় এবং লিঙ্গের অগ্রভাগে একটা

ছিদ্রের মাধ্যমে বাইরে উন্মুক্ত হয়। এ নালীকে Urethra বলে। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মানুষের ক্ষেত্রে এই নালীর দৈর্ঘ্য ১৮-২০ সেন্টিমিটার।

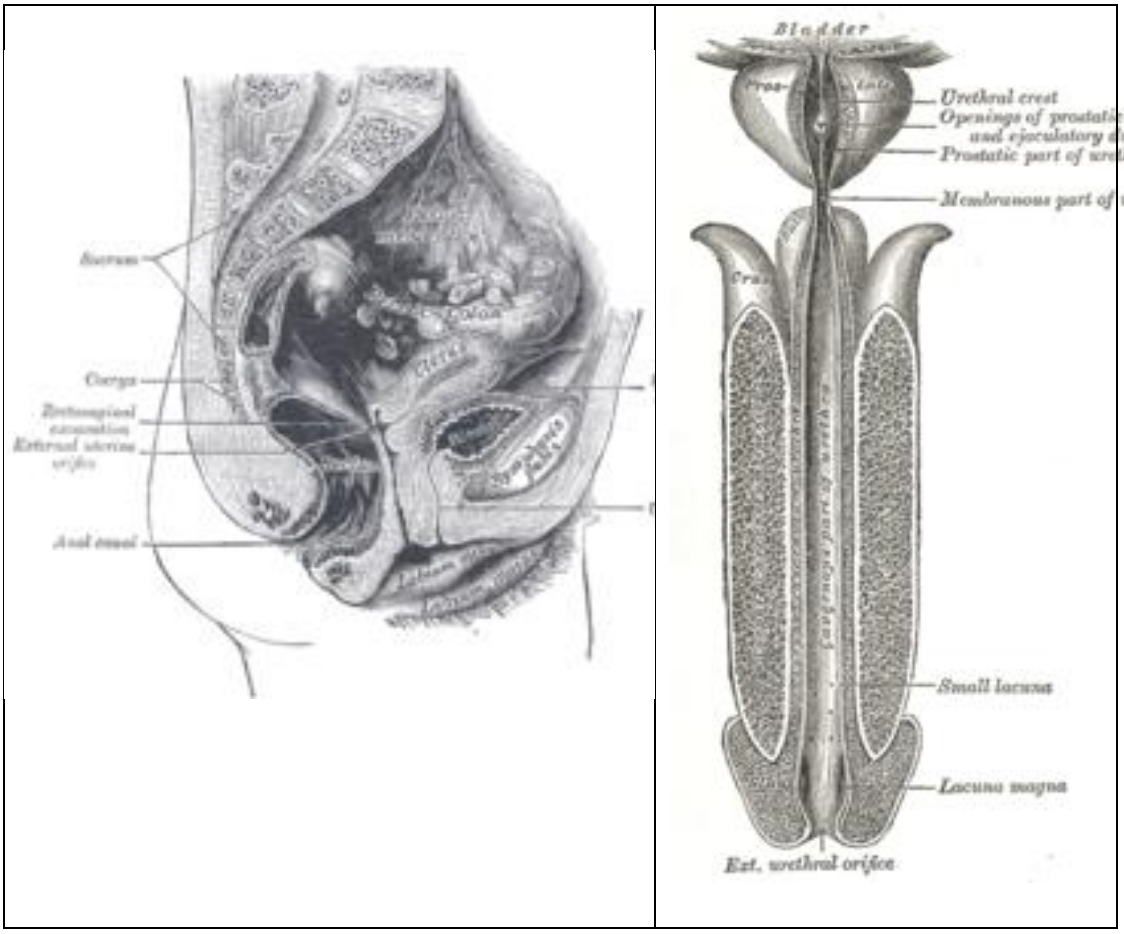

Female urethra

Male urethra

Female person এর ক্ষেত্রে Urethra পৃথক নালী হিসেবে বাইরে উন্মুক্ত হয়। এক্ষেত্রে এ নালীর দৈর্ঘ্য ৩.৫-৪ সেন্টিমিটার।

কাজ ঃ ক) Urethra মাধ্যমে urinary bladder থেকে urine দেহের বাইরে নিষ্কাশিত হয়।

শিক্ষার্থীবৃন্দ এতক্ষন আমরা Urinary System এর বিভিন্ন অংশ নিয়ে কিছু জানার চেষ্টা করলাম।

ইউনিট ৫: শ্বাসতন্ত্র

পাঠ ৫.১: শ্বাসতন্ত্র - ফুসফুস, নাক ও নাসিকা গহবর, ফ্যারিংক্স ও ল্যারিক্স

প্রথমেই আমরা আজকের পাঠের উদ্দেশ্য সমূহ জেনে নেই, এই পাঠ শেষে আমরা জানতে পারবো-

- Respiration কি?
- কি কি Parts নিয়ে Respiratory system গঠিত?
- বিভিন্ন প্রকার Parts এর অবস্থান কোথায় এবং এর কাজ কি? এবং
- কিভাবে Respiration সংগঠিত হয়।

Respiration একটি গুর"ত্বপূর্ণ শারীর বৃত্তীয় প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় পরিবেশ থেকে বাতাসের O2 জীবের দেহাভ্যন্ড়রে প্রবেশ করে। এই O2 সরল খাদ্য বা গ-ুকোজকে ধাপে ধাপে জারিত করে। ফলে খাদ্য ভেঙ্গে যায় এবং খাদ্যের ভিতরে স্থিতি শক্তিকে গতি শক্তি বা তাপ শক্তিতে রূপান্ড়রিত করে।

অর্থ্যাৎ respiration এর ফলে cell এর ভিতরের সঞ্চিত খাদ্য জারিত হইয়া CO2 ও তাপশক্তি নির্গত হয়। তাহলে Respiration বলতে আমরা বুঝি - যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় পরিবেশ থেকে গৃহীত O2 দ্বারা কোষস্থিত গ-ুকোজ ধাপে ধাপে জারিত হয়ে খাদ্যের স্থিতি শক্তিকে গতিশক্তি বা তাপশক্তিরূপে মুক্ত করে এবং উপজাত দ্রব্য হিসেবে সৃষ্ট CO2 ও পানি দেহ থেকে নিষ্কাশিত হয় তাকে respiration/ শ্বসন বলে।

Respiratory system Respiration প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী অঙ্গসমূহকে একত্রে Respiratory system.

Respiratory system

Respiratory system নিম্নলিখিত অঙ্গগুলো নিয়ে গঠিত। যথা-

১. Nose, Nostrils, Nasal cavity
২. Nasopharynx
৩. Larynx
৪. Trachea
৫. Bronchus
৬. Lungs
৭. Diaphragm

১। **নাক** (Nose) ঃ Nose একটি ত্রিকোনাকার বা পিরামিড আকৃতির ফাঁপা অঙ্গ। এটি মাথার দুচোখ এবং উপরের ঠোটের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। মানুষের নাকের অগ্রপ্রান্ড়র অঙ্কীয় দিকে একজোড়া ডিম্বাকার নাসারন্ধ্র থাকে। এদের পিছনে একজোড়া প্রশস্ড় Nasal cavity অবস্থিত। Nasal cavity সামনের অংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোম দ্বারা আবৃত এবং পিছনের অংশ মিউকাসঝিলি- দ্বারা আবৃত। একটা পাতলা

প্রাচীর দ্বারা/ Nasal septum দুটো পরস্পর থেকে পৃথক থাকে। নাক, অস্থি, তর"নাস্থি, পেশী ও যোজক কলা নির্মিত একটি ফাপা অঙ্গ।

কাজ ঃ নাসারন্ধ্রের মাধ্যমে অক্সিজেন সমৃদ্ধ বাতাস দেহাভ্যন্ড়রে প্রবেশ করে এবং কার্বন-ডাই- অক্সাইড যুক্ত বাতাস দেহ থেকে বের হয়ে যায়।
খ) প্রশ্বাস বায়ুতে যে সব ধূলিকণা ও রোগজীবাণু থাকে, লোম ও শে-ষ্ম ঝিল-ী তাদের ছাঁকনীর মত আটকে রাখে।
গ) নাকের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হবার সময় বাতাস কিছুটা গরম ও আর্দ্র হয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করে, যাতে শীতল বাতাস এর কোন ক্ষতি করতে না পারে।
ঘ) আমরা নাসারন্ধ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন দ্রব্যের ঘ্রাণ গ্রহণ করি।

২। Nasopharynx ঃ মুখ হা করলে মুখগহবরের সর্বপশ্চাতে যে অংশটি দেখা যায় তাই Nasopharynx. একটি Nasopharynx নামে একটা সাধারণ প্রকোষ্ঠে উন্মুক্ত হয়। Nasopharynx, Nasal cavityর পিছন থেকে স্বরযন্ত্রের উপর পর্যন্ড় বিস্তৃত। Nasopharynx পিছনের অংশ গ-টিস নামক ছিদ্রের মাধ্যমে trachea এবং গ্যালেট নামক ছিদ্রের মাধ্যমে oesophagus এ দুটো নালীতে প্রবেশ করে।

কাজ ঃ খাদ্যদ্রব্য গলাধঃকরণকালে শক্ত খাদ্যকণা গলবিলের অন্ড়গাত্র স্পর্শ করলে এপিগ-টিস trachea পথ বন্ধ করে দেয়, ফলে খাদ্য কণা trachea প্রবেশ না করে, oesophagus প্রবেশ করে। Pharynx বাতাস প্রবেশ করলে এপিগ-টিস trachea মুখ উন্মুক্ত করে রাখে। ফলে প্রশ্বাস বায়ু trachea পথে প্রবাহিত হয়ে Lungs এ যায়।

৩। Larynx ঃ Nasopharynx পিছনের ট্রাকিয়ার সামনের প্রান্ড়ে ল্যারিংস বা স্বরযন্ত্র অবস্থিত। এ অঙ্গটি স্বরধ্বনী উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে। ল্যারিংসের প্রাচীর একটি থাইরয়েড, দুটি এরিটিনয়েড ও একটি ক্রিকয়েড এ চারটি কার্টিলেজ নিয়ে গঠিত। স্বরযন্ত্রের গহবরে এক জোড়া সংক্ষিপ্ত, স্থিতিস্থাপক পর্দা টান টান ভাবে বিস্তৃত। একে স্বরতন্ত্রী বা ভোকাল কর্ড বলে। ভোকাল কর্ড-এর কম্পনের ফলে স্বরের উৎপত্তি হয়। স্বরযন্ত্রের উপরিভাগে অবস্থিত জিহবা আকৃতির ঢাকনাকে epiglottis বলে। এটা তরুনাস্থি দ্বারা ঘটিত।

কাজ ঃ স্বরযন্ত্র স্বর উৎপাদনে অংশ নেয়।

৪। Trachea ঃ স্বরযন্ত্রের পরবর্তী নলাকার অংশকে ট্রাকিয়া বা শ্বাসনালী বলে। এ নালীর পিছন দিকে অন্ননালী বা oesophagus অবস্থিত। Tracheaর প্রবেশমুখে এপিগ-টিস (epiglottis) নামে একটি চ্যাপ্টা পর্দার মত আবরণী বা ঢাকনা থাকে। এ ঢাকনা খাদ্য গ্রহণ করার সময় Tracheaর মুখ বন্ধ করে রাখে, ফলে খাদ্য কণা স্বরযন্ত্র বা Tracheaতে ঢুকতে পারে না। কিন্তু কথা বলার সময় এ পর্দা খুলে যায়। Trachea প্রায় ১০-১৫ সেমি লম্বা এবং এর প্রাচীর পাতলা পেশী দ্বারা গঠিত। এ প্রাচীরের গায়ে ১৫-২০টি কোমলাস্থি গঠিত ও বলয়াকৃতির ট্রাকিয়াল রিং থাকে। এসব রিং Tracheaকে চুপসে যেতে দেয় না। Tracheaর ভিতরের গাত্র সূক্ষ্ম সিলিয়াযুক্ত আবরণী টিস্যু দ্বারা আবৃত থাকে।

কাজ ঃ Tracheaর মধ্যে দিয়ে অক্সিজেনসমৃদ্ধ বাতাস নাসিকাগহবর থেকে দেহাভ্যন্ড়রে Lungsর মধ্যে প্রবেশ করে এবং Lungs থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইডযুক্ত বাতাস Nasal cavityর মাধ্যমে দেহের বাইরে বের হয়ে যায়।

৫। Bronchus ঃ ট্রাকিয়া Lungs এর কাছাকাছি পৌঁছে ডান ও বাম শাখা বা ডান ও বাম বায়ুনালী বা ব্রঙ্কাসে পরিণত হয়। এরা যথাক্রমে ডান ও বাম Lungs এ প্রবেশ করে। Lungs এর ভিতরে প্রতিটি ব্রঙ্কাস প্রথমে সিলিয়ামযুক্ত বহু সংখ্যক ব্রঙ্কিওলে ও পরে ব্রঙ্কিওলগুলো অসংখ্য অনুক্রোমনালী বা শাখা ব্রঙ্কিওলে বিভক্ত হয়। পরবর্তীতে এ সকল ব্রঙ্কিওলের প্রতিটির শেষ প্রান্ড় স্ফীত হয়ে বায়ুথলি বা এলভিওলী নামক থলিতে উন্মুক্ত হয়। ব্রঙ্কিওলগুলোর প্রাচীরে ট্রাকিওল রিং থাকে না। প্রতিটি Lungs এ অসংখ্য এলভিওলী থাকে।

কাজ ঃ Bronchus দ্বয় Trachea থেকে অক্সিজেন সমৃদ্ধ বাতাস ফুসফুসে পরিবহন করে এবং ফুসফুস থেকে CO_2 যুক্ত বাতাস Trachea পৌঁছায়।

৬। Lungs ঃ Lungs মানুষের প্রধান Respiratory অঙ্গ। এ অঙ্গের মাধ্যমেই পরিবেশের বাতাসের অক্সিজেন রক্তে প্রবেশ করে এবং রক্ত থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড দেহ থেকে বাতাসে ফিরে যায়।

অবস্থান ঃ Lungs দ্বয় chest cavityর হৃদপিন্ডের দুপাশে অবস্থিত। মানুষের Right lungs তিনখন্ডে এবং left lungs দুখন্ডে বিভক্ত। Lungs দুটো স্পঞ্জের মতো সঙ্কোচন প্রসারণশীল টিস্যু দ্বারা গঠিত এবং pleura নামে দ্বিস্ড়রী ঝিল-ী দ্বারা আবৃত। pleura বাইরের স্ড়রকে প্যারাইটাল স্ড়র এবং ভিতরের স্ড়রকে ভিসেরাল স্ড়র বলে। এ দুস্ড়রের মধ্যে এক ধরনের তরল থাকে। ফলে শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগের সময় স্ড়র দুটোর মধ্যে ঘর্ষণ হয় না।

৭। Diaphragm ঃ মানুষের দেহগহবরে পেশী গঠিত ও সঙ্কোচন প্রসারণশীল একটি অনুপ্রস্থ পর্দা থাকে। এ পর্দা দেহে গহবরকে উপরের দিকে chest cavity ও নীচের দিকে abdomen বিভক্ত করেছে। chest cavityর মাঝখানে হৃৎপিন্ড এবং হৃদপিন্ডের দুপাশে ফুসফুসদ্বয় অবস্থিত। Diaphragmর উপরের দিকে উত্তল এবং নীচের দিক অবতল। এ পর্দা ভেদ করেই পৌষ্টিক নালী রক্তনালী ইত্যাদি উদর গহবরে প্রবেশ করে।

কাজ ঃ শ্বাসগ্রহণের সময় ডায়াফ্রাম নীচে নেমে বক্ষগহবরকে প্রসারিত করে। এ সময় ফুসফুসদ্বয় প্রসারিত হয় এতে শূণ্যতার সৃষ্টি হলে বাইরের থেকে O_2 সমৃদ্ধ বাতাস ফুসফুসে প্রবেশ করে। শ্বাস-ত্যাগের সময় ডায়াফ্রাম উপরে উঠে এবং জায়গা মত ফিরে আসে। এসময় ফুসফুসদ্বয় সঙ্কুচিত হয়। ফলে ফুসফুস থেকে CO_2 যুক্ত বাতাস পরিবেশে ফিরে যায়।

শ্বসন প্রক্রিয়া

Respiration/ শ্বসন দুই পর্যায়ে ঘটে।

১. External respiration/ বহি:শ্বসন
২. Internal respiration / অন্ড়:শ্বসন

External respiration/ বহি:শ্বসন- এখানে O2, lungs হইতে রক্তে প্রবেশ করে এবং রক্ত হইতে CO2, lungs এ প্রবেশ করে। এই exchange হয় lungs এর alvuolar এর মধ্যে।

Internal respiration / অন্ড়:শ্বসন- শ্বসন এই পর্যায়ে lungs এর alvuolar এর সমুহের বাতাস এবং এদের গাত্রস্থিত কৈশিকনালী সমূহের রক্তের মধ্যে O2 ও CO2 মধ্যে বিনিময় ঘটে।

মানুষের শ্বসন দুটো ধাপে ঘটে। যথা-
১। বহিঃশ্বসন এবং
২। অন্ড়ঃশ্বসন

১। বহিঃশ্বসন বর্ণনা ঃ ফুসফুসের গহবরে এলভিওলাসের বাতাস ও রক্তনালিকার রক্তের মধ্যে গ্যাসের যে বিনিময় ঘটে, তাকে বহিঃশ্বসন বলে। বহিঃশ্বসনের আবার দুটো পর্যায়ঃ ক) শ্বাসগ্রহণ বা প্রশ্বাস Inspiration এবং খ) শ্বাস ত্যাগ বা নিঃশ্বাস Expiration।

প্রশ্বাস প্রক্রিয়ার বর্ণনা ঃ এ পর্যায়ে .... সমৃদ্ধ বাতাস বাইরে থেকে ফুসফুসে প্রবেশ করে ও ব্যাপন পদ্ধতিতে কৈশিক নালীর রক্তে প্রবেশ করে।
এ সময় বক্ষপিঞ্জরের পর্শুকাগুলোর মধ্যবর্তী ইন্টারকস্টাল ... পেশীসমূহ সংকুচিত হয়। ফলে পর্শুকাগুলো উপরের দিকে উঠে যায় এবং সামনের দিকে অগ্রসর হয়। একই সাথে মধ্যচ্ছদা নীচে নেমে আসে। ফলে বক্ষ গহবরের আয়তন বেড়ে যায় এবং অন্ড়ঃস্থ পি-উরায় চাপ কমে গিয়ে ফুসফুসের আয়তন বৃদ্ধি পায়। ফলে আন্ড়ঃফুসফুসীয় চাপ কমে গিয়ে বাইরের পরিবেশ থেকে ... সমৃদ্ধ বাতাস ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং শ্বাসগ্রহণ ঘটে।
ফুসফুসের বায়ুথলিসমূহ রক্তজালকে দ্বারা বেষ্টিত থাকে। {শিরার রক্তে অক্সিজেনের পরিমান কম থাকে, কিন্তু বায়ুথলির (....) বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ বা ঘনত্ব বেশী থাকে।} ফলে শিরার রক্তে .... এর চাপ কম হয় এবং বায়ুথলিতে ....এর চাপ বেশী হয়। চাপের এ পার্থক্যের জন্য ব্যাপন প্রক্রিয়ায় ... বায়ুথলি হতে কৈশিক নালীর রক্তে প্রবেশ করে।

খ) নিঃশ্বাস বা শ্বাসত্যাগ ঃ শ্বসনের যে প্রক্রিয়ায় আমরা ফুসফুসের ভিতরের .... যুক্ত বাতাস পরিবেশের বায়ুতে (বাইরে) ছেড়ে দেই, তাকে নিঃশ্বাস বা শ্বাসত্যাগ বলে। প্রশ্বাস ক্রিয়ার সাথে জড়িত পেশীসমূহের সংকোচন শেষ হলে পেশীসমূহ শ-থ হয়ে যায় ও বক্ষ গহবর পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। এ সময় মধ্যচ্ছদা উপরে উঠে স্বাভাবিক অবস্থায় অবস্থান করে। ফলে ফুসফুসের আয়তন হ্রাস পায় এবং এর আভ্যন্ড়রীন চাপ বায়ুমন্ডলের চাপ অপেক্ষা বেড়ে যায়। ফলে ফুসফুস থেকে বায়ু সহজে বাইরে নির্গত হয়। শিরার রক্তে কার্বন ডাই-অক্সাইড ... ঘনত্ব বায়ুথলির বাতাসের ... অপেক্ষা পেশী থাকে বলে শিরার রক্তে ..... এর চাপ বায়ুথলির ... এর চাপ অপেক্ষা বেশী হয়। চাপের এ পার্থক্যের দর"ণ ব্যাপন প্রক্রিয়ায় .... শিরার রক্ত হতে বায়ুথলি বা এলভিওলাসে প্রবেশ করে।

২) অন্তঃশ্বসন ঃ শ্বসনের এ পর্যায়ে ফুসফুসের গহবরের ভিতরে এ্যালভিওলাই সমূহের বাতাস এবং এদের গাত্রের কৈশিক নালী সমূহের রক্তের মধ্যে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইডের বিনিময় ঘটে এবং কোষীয় পর্যায়ে খাদ্য জানণের ফলে শক্তি উৎপন্ন হয়। অন্ড়শ্বসনের ৩টি উপপর্যায়। যথাঃ ক) অক্সিজেন পরিবহন, খ) গ-ুকোজের জারণ ও শক্তি উৎপাদন এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিবহন।

ক) অক্সিজেন পরিবহন ঃ প্রশ্বাসের মাধ্যমে প্রবেশকৃত বাতাস এলভিওলাসের মিউকাসের পানিতে দ্রবীভূত হয়। এলভিওলাসের প্রাচীর গাত্রের মিউকাস গ্রন্থি থেকে মিউকাস নিঃসৃত হয়। এতে এলভিওলাস গহবরে অক্সিজেনের চাপ বৃদ্ধি পায়। এ অক্সিজেন ব্যাপন পদ্ধতিতে কৈশিক নালীতে প্রবেশ করে। কৈশিক নালীতে অক্সিজেন রক্তের হিমোগে-াবিনের সাথে বিক্রিয়া করে অস্থায়ী যৌগ অক্সি-হিমোগে-াবিন (.....) গঠন করে। এ যৌগ রক্তের মাধ্যমে হৃৎপিন্ড হয়ে দেহকোষে যায় এবং সেখানে অক্সিজেন বিমুক্ত হয়। এ অক্সিজেন কোষস্থিত গ-ুকোজকে জারিত করে শক্তি উৎপন্ন করে।

শ্বসনের ভূমিকা Function of Respiration system

১) গ্যাসীয় বিনিময় ঃ ফুসফুস ও কৈশিক জালিকার মধ্যে গ্যাসীয় বিনিময়ের মাধ্যমে বায়ুমন্ডলীয় অক্সিজেন রক্তে প্রবেশ করে এবং রক্ত হইতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ফুসফুসের মাধ্যমে বায়ুমন্ডলে মুক্ত হয়।

২) বিপাক ঃ অক্সিজেনের প্রভাবে কলাকোষে সবাত বিপাক ক্রিয়া সংঘটিত হয়, ফলে দেহের প্রয়োজনীয় জৈবশক্তি উৎপন্ন হয়।

৩) রাসায়নিক বিক্রিয়া ঃ গৃহীত অক্সিজেন কলাকোষের বিবিধ রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপে ব্যবহৃত হয়।

৪) রেচন ঃ নিঃশ্বাসকালে অ্যামোনিয়া, অ্যাসিটোন জাতীয় কিটোন বডি, অ্যালকোহল প্রভৃতি রেচনদ্রব্য নির্গত হয়।

৫) অম্--ক্ষার সাম্যতা রক্ষা ঃ নিঃশ্বাসকালে নির্গত কার্বন-ডাই-অক্সাইড রক্তের অম্--ক্ষারের সাম্যতা রক্ষা করিয়া বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৬) পানিসাম্য নিয়ন্ত্রণ ঃ দেহে পানিসাম্যের উপর শ্বসনের বিশেষ ভূমিকা আছে। নিঃশ্বাসের সময় ৬০০-৮০০ মি.লি. পানি দেহ হইতে নির্গত হয়।

৭) দেহতাপ নিয়ন্ত্রণ ঃ নিঃশ্বাসের মাধ্যমে দেহ হইতে প্রচুর তাপ নির্গত হইয়া দেহতাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

৮) রক্তচাপ ও হৃৎক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ ঃ সমগ্র শ্বসন প্রক্রিয়া পরোক্ষভাবে রক্তচাপ ও হৃদপিন্ডের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

ইউনিট ৬ ঃ বেসিক ফিজিওলজি

পাঠ ৬.১ ফিজিওলজি পাঠের প্রয়োজনীয়তা

ফিজিওলজি

বিজ্ঞানের যে শাখায় এমন কিছু ভৌত ও রাসায়নিক প্রভাবকের কার্যকারিতা ব্যাখ্যা নিয়ে আলোচনা করা যা জীবনের উৎস, বৃদ্ধি ও অগ্রগতির জন্য কাজ করে তাকে ফিজিওলজি বা শারীরবিজ্ঞান বলে।

হিউম্যান ফিজিওলজি

চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে শাখায় মানব দেহ ও এ অঙ্গের স্বাভাবিক ক্রিয়া এবং এর প্রধান কার্যপদ্ধতি এবং নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আলোচনা করে তাকে হিউম্যান ফিজিওলজি বা মানব শরীরবিজ্ঞান বলে।
এক কথায় বিজ্ঞানের যে শাখায় দেহের বিভিন্ন অংশের কাজ ও কার্যপ্রণালী নিয়ে আলোচনা করে তাকে ফিজিওলজি বা শারীর বিজ্ঞান বলে।

ফিজিওলজি পাঠের প্রয়োজনীয়তা

ফিজিওলজিকে বলা হয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের ২য় পাঠ। এটি অধ্যয়ন ব্যতীত কেউই চিকিৎসা বিজ্ঞানে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে সমর্থ হবে না। নিচে কিছু উদাহারণ দিয়ে ফিজিওলজির প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হলো-

- ✓ মানব চিকিৎসা করতে হলে প্রথমেই জানতে হবে মানব দেহের কার্যাবলী। ফিজিওলজি মানব দেহের কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা করে।
- ✓ একটি অঙ্গের স্বাভাবিক ক্রিয়া জানলেই অস্বাভাবিক উপলব্ধি করা যাবে। আর অঙ্গের ক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে ফিজিওলজি।
- ✓ দেহের কোন একটি অঙ্গ কোন অস্বাভাবিক লক্ষণ/চিহ্ন প্রকাশ করলে, সে লক্ষণ সৃষ্টির প্রক্রিয়া জানতে হলে সংশ্লিষ্ট অঙ্গের ক্রিয়া সম্পর্কে ধারনা থাকতে হবে। শুধুমাত্র ফিজিওলজি মাধ্যমেই এই ধারণা লাভ সম্ভব।
- ✓ রোগ নির্ণয়ের জন্য কি কি পরীক্ষা দেয়ার প্রয়োজন হতে পারে, ফিজিওলজি অধ্যয়নের মাধ্যমে সে বিষয়েও দিক নির্দেশনা লাভ করা যায়।
- ✓ ঔষধের ক্রিয়া হলে ফিজিওলজি আবশ্যক।

শরীরবৃত্তিয় তন্ত্র

একগুচ্ছ অঙ্গ বা কলা যখন একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে কাজ করে তখন তাদের মিলিত ভাবে তন্ত্র নামে আখ্যায়িত করা হয়। যখন কিছু অঙ্গ বা কলা সম্মিলিতভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ কার্য সম্পাদন করে তখন মিলিত ভাবে তাদের শারীরবৃত্তিয় তন্ত্র বলে।
দেহ কিছু শারীরবৃত্তিয় তন্ত্রের মাধ্যমে ক্রিয়া করে (যারা হরমোন ও স্নায়ুর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়)
মানব দেহের গুরুত্বপূর্ণ ফিজিওলজিক্যাল সিস্টেম বা শারীরবৃত্তিয় তন্ত্র সমূহ-

তন্ত্র	কাজ
নার্ভাস সিস্টেম স্নায়ুতন্ত্র	দেহের বিভিন্ন অংশের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন
এন্ডোক্রাইন সিস্টেম বা অন্তক্ষরা তন্ত্র	দেহের বিভিন্ন অংশের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ
রেসপিরেটরি সিস্টেম বা শ্বাস তন্ত্র	শ্বাস প্রশ্বাসে সহায়তা করা
কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেম বা রক্ত-সংবহন তন্ত্র	রক্ত সংবহন
লিম্ফেটিক সিস্টেম বা লসিকা তন্ত্র	লসিকা সংবহন ও প্রতিরোধ্যতা
ডাইজেষ্টিভ সিস্টেম বা পরিপাক তন্ত্র	খাদ্য পরিপাক ও শোষণ
হেপাটোবিলিয়ারি সিস্টেম বা যকৃত-পিত্ত তন্ত্র	পিত্ত তৈরি ও সরবরাহ
ইউরিনারি সিস্টেম বা মূত্র সংবহন তন্ত্র	মূত্র তৈরি ও নিষ্কাশন
রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেম বা জনন তন্ত্র	প্রজনন
মাস্কুলো-স্কেলেটাল সিস্টেম বা অস্থি-পেশি তন্ত্র	নড়াচড়া

হোমোস্টাসিস

মানবদেহের সাধারণ কার্যাবলী

মানুষকে ক্রিয়াশীল রাখতে এর দেহের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন ধরনের কার্যাবলী সাধন করে। গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে-

- ✓ কার্যাবলী সাধনের উদ্দিপনা সৃষ্টি ঃ দেহের বিভিন্ন অংগের কর্ম সম্পাদনের উদ্দিপনা প্রক্রিয়াকরন, সৃষ্টি ও বিস্তার। নার্ভাস সিস্টেম এর জন্য ক্রিয়াশীল।
- ✓ দেহের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু তৈরি ঃ মানব দেহ দেহের ক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ (যেমন কোষ, বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ইত্যাদি) তৈরি করে।
- ✓ বৃদ্ধি ও বিকাশ ঃ জন্মের পর হতে দেহের বিভিন্ন অংশ ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধিপাচ্ছে/বিকশিত হচ্ছে।
- ✓ শ্বসন/শ্বাস প্রশ্বাস ঃ দেহের প্রতিটি কোষের বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন অত্যাবশ্যক। কোষ এই অক্সিজেন ব্যবহার করে বর্জ্য হিসেবে কার্বনডাই অক্সাইড তৈরি করে। শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে অক্সিজেন দেহের প্রতিটি কোষ-কলায় পৌছে এবং কার্বনডাই অক্সাইড দেহ থেকে বের হয়ে যায়। রেসপিরেটরি সিস্টেম দ্বারা এই ক্রিয়া সাধিত হয়।
- ✓ রক্ত সঞ্চালন ঃ রক্ত বেঁচে থাকার জন্য অত্যাবশ্যক। এই রক্ত দেহের প্রতিটি অংশে অক্সিজেন ও পুষ্টি উপাদান পৌছে দেয় এবং সেখান থেকে সৃষ্ট বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনের উদ্দেশ্য বের করে নিয়ে আসে। কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেম দ্বারা এই ক্রিয়া সাধিত হয়।
- ✓ দেহের বর্জ্য নিষ্কাশন ঃ পুষ্টি উপাদান ব্যবহার ও বিভিন্ন কারণে দেহে বর্জ্য পদার্থের সৃষ্টি হয়। এই বর্জ্য পদার্থ দেহ হতে নিষ্কাশন করা অত্যাবশ্যক। ইউরিনারী সিস্টেম এই বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন করে।
- ✓ পরিপাক ও শোষন ঃ দেহের বৃদ্ধি, বিকাশ ও ক্রিয়া সাধনের জন্য পুষ্টি উপাদান অত্যাবশ্যক। বিভিন্ন বাহ্যিক উৎস হতে এই পুষ্টি উপাদান সৃষ্টি ও দেহের রক্ত ধারায় প্রবেশ করানোর মাধ্যমে এই পুষ্টি ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। ডায়জেস্টিভ সিস্টেম বা পরিপাক তন্ত্র এই ক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত।

- ✓ বিপাক ঃ মূলত বিপাকক্রিয়ার মাধ্যমে পুষ্টি উপাদান সঞ্চয়, সঞ্চিত পুষ্টি বিষাক্ত পদার্থ নিষ্ক্রিয়করণ ইত্যাদি কার্য সম্পন্ন হয়। দেহের সমস্ত কোষেই এই ক্রিয়া ঘটে থাকে।
- ✓ প্রতিরোধ ঃ বিভিন্ন ধরনের জীবাণু বা বহিস্থ বস্তু দেহের রোগ সৃষ্টি করতে পারে। তাই এ ধরনের বস্তু দেহে প্রবেশ করলে তাকে সানাক্তকরণ, নিষ্ক্রিয়করন ও ধ্বংস করা আবশ্যক। ইমিউন সিস্টেম এই ক্রিয়া সম্পাদন করে।
- ✓ প্রজনন ঃ প্রতিটি জীবই তার পরবর্তী বংশধর তৈরি করতে চায়। তারই ধারাবাহিকতায় মানুষও প্রজনন ক্রিয়ার মাধ্যমে তার পরবর্তী বংশধর তৈরি করে। রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম বা প্রজনন তন্ত্র এই ক্রিয়া সম্পাদন করে।
- ✓ দেহের সঞ্চালন ঃ প্রাণী হিসেবে মানুষ নড়া চড়া করতে পারে। মাসকুলোস্কেলেটাল সিস্টেম এই ক্রিয়া সাধন করে।
- ✓ দেহের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় ঃ দেহের বিভিন্ন কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় সাধন প্রয়োজন। নার্ভাস সিস্টেম ও এন্ডোক্রাইন সিস্টেম এই ক্রিয়া সাধন করে।

মানবদেহের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ

দেহের কার্যাবলী দুটি প্রধান নিয়ন্ত্রক ফিজিওলজিক্যাল সিস্টেম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

১. স্নায়ুবিক নিয়ন্ত্রণ।
২. হরমোনাল নিয়ন্ত্রণ।

নার্ভাস বা স্নায়ুবিক নিয়ন্ত্রণ - স্নায়ু তন্ত্র তিনটি প্রধান অংশ দ্বারা গঠিত, যথা -

১. সেনসরি রিসেপ্টর বা অনুভূতি সংগ্রাহক অংশ-এরা দেহের বিভিন্ন অনুভূতি যেমন স্পর্শ, দর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে কেন্দ্রে প্রেরণ করে।
২. কেন্দ্রীয় স্নায়ু তন্ত্র-মস্তিষ্ক ও স্পাইনাল কর্ডের সমন্বয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক। এখানে তথ্য পরিবহন, জমা রাখা, ও তথ্য অনুযায়ী কাজের নির্দেশ করা সংক্রান্ত সকল কার্য সম্পাদিত হয়।
৩. মোটর বা চালক অংশ-মস্তিষ্ক কোন তথ্য পেলে, এই তথ্য প্রক্রিয়াজাত করে মোটর অংশের মাধ্যমে সে কার্য বাস্তবায়ন করে।

হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ

হরমোন হলো বিশেষ ধরনের জৈব রাসায়নিক পদার্থ যা এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড (অন্তক্ষরা গ্রন্থি) হতে নিঃসৃত হয়। বিভিন্ন ধরনের হরমোন দেহের সার্বিক কার্যাবলী নিয়ন্ত্রনে ভূমিকা পালন করে।

বডি ফ্লুইড অসমতা

সাধারণভাবে দুই ধরনের বডিফ্লুইড অসমতা রয়েছে-

১. ইডেমা
২. ডিহাইড্রেশন

ইডেমা বা শোথ

ইন্টারস্টিসিয়াল স্থানে অস্বাভাবিকভাবে অতিরিক্ত তরল পদার্থ জমে যাওয়াকে ইডমা বা শোথ বলে।

শ্রেণী বিভাগ

ক) স্থান অনুসারে

১. লোকালাইজড ইডেমা (স্থানিক শোথ)

২. জেনারেলাইজড ইডেমা (সার্বিক শোথ)

খ) প্রকৃতি অনুসারে

১. পিটিং (চাপ সংবেদনশীল)

২. নন-পিটিং (চাপ সংবেদনশীল)

ইডেমার সাধারণ কারণসমূহ

ক) জেনারেলাইজড বা সার্বিক

✓ কনজেসটিভ কার্ডিয়াক ফেইলুর

✓ নেফ্রেটিক সিন্ড্রোম

✓ লিভার সিরোসিস

✓ প্রোটিন এনার্জি ম্যালনিউট্রিশন

খ) লোকালাইজড

✓ ইনফ্লামেশন

✓ রক্ত নিষ্কাশনে প্রতিবন্ধকতা

✓ লসিকা নিষ্কাশনে প্রতিবন্ধকতা

✓ এজিওনিউরোটিক শোথ

গ) চাপ অসংবেদনশীল

✓ হাইপোথাইরয়ডিজম

✓ ফাইলেরিয়াসিস

ডিহাইড্রেশন বা পানিশূন্যতা

অস্বাভাবিক ভাবে দেহের পানি ও ইলেক্ট্রোলাইট কমে গেলে তাকো ডিহাইড্রেশন বা পানিশুন্যতা বলা হয়।

ডিহাইড্রেশ এর কারণ

ডিহাইড্রেশ এর প্রধান কারণ

ডিহাইড্রেশ এর প্রধান কারণ

ক) দেহ থেকে পানি বেরিয়ে গেলে

✓ ডায়বেটিস মেলিটাস

✓ ডায়বেটিস ইনসিপিডাস

✓ ডায়রিয়া

- ✓ বমি
- ✓ অতিরিক্ত ঘাম

খ) প্রয়োজনের তুলনায় কম পানি গ্রহণ
ডিহাইড্রেশনের লক্ষণ
ডিহাইড্রেশনের প্রধান লক্ষণ সমূহ-

- ✓ চোখ বসে যাওয়া
- ✓ জাইগোমেটিক হাড়ের স্পষ্টতা
- ✓ শুষ্ক জিহ্বা
- ✓ ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা কমে যাওয়া।

শরীর বিদ্যা

ইউনিট-১ :

পাঠ ১.১: সংজ্ঞা, শ্রেণী বিভাগ

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা

১. শারীরবিদ্যা বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারবে;
২. শারীরবিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজনিয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে;
৩. শারীরবিদ্যার বিভিন্ন তন্তের কার্যক্রম ও তাদের ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা লাভ ও ব্যাখ্যা করতে পারবে; এবং
৪. স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে শিক্ষার্থীর করণীয় কী তা বলতে পারবেন।

ফিজিওলজি

চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে শাখায় মানব দেহ এবং তার বিভিন্ন অঙ্গের স্বাভাবিক ক্রিয়াসহ এর প্রধান কার্যপদ্ধতি এবং নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আলোচনা করে তাকে ফিজিওলজি বা মানব শরীরবিজ্ঞান বলে।সাধারনভাবে, বিজ্ঞানের যে শাখায় দেহের বিভিন্ন অঙ্গের স্বাভাবিক কাজ ও তাদের কার্যপ্রণালী নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে ফিজিওলজি বা শারীর বিজ্ঞান বলে।

অপরদিকে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে শাখায় কিছু ভৌত ও রাসায়নিক প্রভাবকের কার্যকারিতা নিয়ে আলোচনা করা হয় যা জীবনের স্বাভাবিক পক্রিয়া, বৃদ্ধি ও অগ্রগতির জন্য কাজ করে তাকে ফিজিওলজি বা শারীরবিজ্ঞান বলে।

মানবদেহ বিভিন্ন ধরণের অসংখ্য কোষ (Cell) দিয়ে গঠিত। এই কোষ হল মানব দেহের গঠন ও কার্যক্রমের একক। একই রকমের গঠন ও একই রকমের কাজ সম্পন্ন কতগুলো কোষ মিলে কলা (Tissue) তৈরি হয় এবং একই রকমের কার্যাবলী সম্পন্ন অনেকগুলো কলা মিলে আমাদের দেহের এক একটি অঙ্গ (Organ) তৈরি হয়।

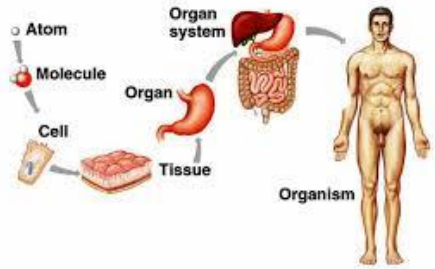

চিত্র ১: মানবদেহ গঠনের পরিক্রমা

শরীরবিজ্ঞান (Physiology) সম্পর্কে জানার সুবিদার্থে একই ধরনের কাজ করে এমন কয়েকটি অঙ্গ এবং কলা নিয়ে গঠিত হয় একটি তন্ত্র বা সিস্টেম (System)। এ ধরণের মোট নয়টি তন্ত্র বা সিস্টেম (System) মিলে আমাদের মানবদেহ গঠিত, যেমন-

১. রক্ত ও রক্তসংবহনতন্ত্র
২. স্নায়ুতন্ত্র
৩. পরিপাকতন্ত্র
৪. শ্বসনতন্ত্র
৫. প্রজননতন্ত্র
৬. অন্তক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র
৭. রেচনতন্ত্র
৮. পেশীতন্ত্র
৯. কংকালতন্ত্র

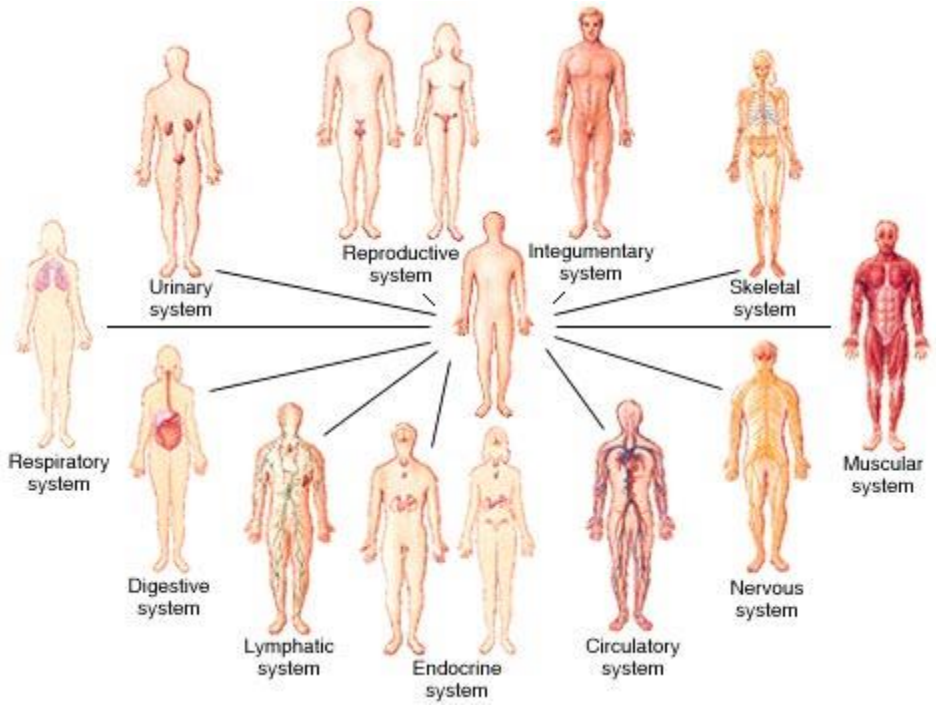

চিত্র ২: মানবদেহের বিভিন্ন তন্ত্র

ফিজিওলজি পাঠের প্রয়োজনীয়তা

ফিজিওলজি বা শরীরবিজ্ঞানকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ২য় পাঠ বলা হয়। ফিজিওলজি বা শরীরবিজ্ঞান অধ্যয়ন ছাড়া চিকিৎসা বিজ্ঞানে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। উদাহারণসহ ফিজিওলজি পাঠের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হলো-

- ✓ সঠিক ও সফল চিকিৎসা করতে হলে মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কার্যাবলী জানতে হবে। ফিজিওলজি অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কার্যাবলী সম্পর্কে জানতে পারব।
- ✓ আমাদের দেহের কোন একটি অঙ্গের স্বাভাবিক ক্রিয়া জানলে আমরা স্বাভাবিকভাবেই অসুস্থ্য অবস্থা জানতে পারব। ফিজিওলজি মানব অঙ্গের স্বাভাবিক ক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে।
- ✓ ফিজিওলজি অধ্যায়নের মাধ্যমেই দেহের কোন একটি অঙ্গের স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক লক্ষণসমূহ জানা যায় এবং সে লক্ষণ সৃষ্টির ধারাবহিকতা সংশ্লিষ্ট কোন অঙ্গের ক্রিয়ায় হচ্ছে তা সম্পর্কে ধারনা লাভ করা যায়।
- ✓ ফিজিওলজি অধ্যয়নের মাধ্যমে রোগ নির্ণয়ের জন্য কি কি পরীক্ষা দেয়ার প্রয়োজন হতে পাওে সে বিষয়েও দিক নির্দেশনা লাভ করা যায়।
- ✓ কিভাবে ঔষধ কাজ করে তা ফিজিওলজি অধ্যয়নের মাধ্যমে ধারনা লাভ করা যায়।

মানবদেহ উপরোক্ত তন্ত্রসমূহের এক সুষম উপস্থাপনা। প্রতিটি তন্ত্রের কাজ সুনির্দিষ্ট। আবার একটি তন্ত্রের কার্যক্রমের ওপর এক বা একাধিক তন্ত্রের কার্যক্রম নির্ভর করে। তন্ত্রসমূহের এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতা অত্যন্ত জটিল এবং জীবন ধারণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন-শ্বসনতন্ত্রের অন্যতম কাজ শীরের

অক্সিজেন সরবরাহ করা। এই অক্সিজেন রক্তসংবহনতন্ত্রের মাধ্যমে সমস্ত দেহে সঞ্চালিত হয়। শ্বসনতন্ত্রের অসুস্থতার কারণে রক্তসংবহনতন্ত্র শরীরে বিশুদ্ধ রক্ত সরবরাহে ব্যর্থ হয় যার ফলে মানুষ মৃত্যুবরণ ও করতে পারে।

পাঠ ১.২: রক্ত ও রক্তসংবহনতন্ত্র

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা

১. রক্ত কি তা বলতে পারবে;
২. রক্তের উপাদান সমূহ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারবে;
৩. রক্তসংবহনতন্ত্র সম্পর্কে ধারণা লাভ ও ব্যাখ্যা করতে পারবে; এবং
৪. মানবদেহে রক্তের প্রয়োজনীয়তা কি তা বলতে পারবে।

রক্ত হচ্ছে এক ধরণের তরল যোজক কলা। রক্ত দেখতে লাল রং হয়ে থাকে। এটি আমাদের দেহের সকল প্রকার কার্যক্রমের ধারক ও বাহক। রক্ত সাধা

১. রক্তরস (Plasma) - ৫৫%
২. রক্তকণিকা - ৪৫%

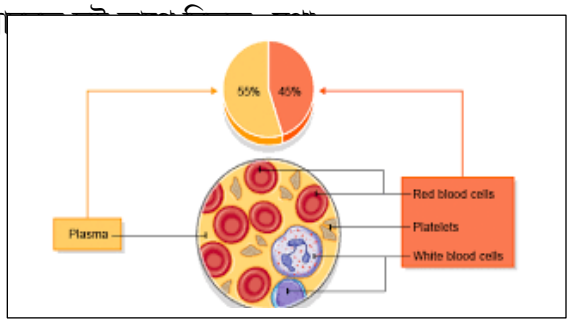

রক্তকণিকা তিনটি উপাদান দিয়ে গঠিত, যেমন -

১. লোহিত কণিকা (RBC),
২. শ্বেতকণিকা (WBC) এবং
৩. অনুচক্রিকা (Platelets)।

চিত্র ৩: মানবদেহের রক্তের উপাদান

১. লোহিত রক্তকণিকা (Red Blood cell) :

- রক্তে লোহিত রক্তকণিকার (Red Blood cell) পরিমান সবচেয়ে অধিক বেশি।
- লোহিত রক্তকণিকায় হিমোগ্লোবিন থাকে বলেই রক্তের রং লাল হয়।
- লোহিত রক্তকণিকায় হিমোগ্লোবিন ফুসফুস থেকে অক্সিজেন পরিবহন কওে দেহের সকল কোষে পৌছে দেয়।
- লোহিত কণিকা প্রধানত অস্থি মজ্জায় (Bone Marrow) তৈরি হয় এবং
- প্রায় ১২০ দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকে।

২. শ্বেত কণিকা (White Blood Cell):

- শরীরের প্রাকৃতিক রোগ প্রতিরোধ অন্যতম উপাদান হল রক্তের শ্বেত কণিকা (White Blood Cell)।
- শ্বেত কণিকা শরীরে প্রবেশকারী ক্ষতিকারক ও রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুকে ধ্বংস করে।
- নিউট্রোফিল (Neutrophil) ব্যাসোফিল (Basophil), ইউসোনোফিল (Eosinophil), লিম্ফোসাইট (খুসঢ়যড়পুঃব) প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের শ্বেত রক্তকণিকার উদাহারণ।
- রক্তে এ কণিকার উপস্থিতি কমে গেলে রোগক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়।

৩. অনুচক্রিকা (Platelets):

- অণুচক্রিকা অন্যান্য রক্ত কণিকার চেয়ে আকৃতিতে অনেক ছোট।

- প্রাণকেন্দ্র (Nucleus) বিহীন এ কণিকা গড়ে ৮-১০ দিন বেঁচে থাকে।
- কোথাও কেটে বা ছিঁড়ে গেলে, ক্ষতস্থানে অণুচক্রিকা রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।

হিমোগ্লোবিন:

লোহিত রক্তকণিকায় প্রচুর পরিমানে হিমোগ্লোবিন থাকে
পুরুষ মানুষে: ১৪-১৭ গ্রাম/প্রতি ১০০ মিলি রক্তে
মহিলা মানুষে: ১২-১৫ গ্রাম/প্রতি ১০০ মিলি রক্তে
মূলত লৌহ এবং গ্লোবিন এর সমন্বয়ে হিমোগ্লোবিন তৈরী হয়ে থাকে

হিমোগ্লোবিন ভেঙ্গে গেলে বিলিরুবিন তৈরী হয় এবং জন্ডিস হয়ে থাকে
রক্তে হিমোগ্লোবিন স্বাভাবিকের চেয়ে কমে গেলে রক্ত শূন্যতা বা এনেমিয়া দেখা দেয়।

চিত্র ৪: মানবদেহের রক্তের উপাদান লোহিত রক্তকণিকা

রক্তসংবহনতন্ত্র (Blood and blood circulatory system): যে প্রক্রিয়ায় রক্ত দেহের প্রধান শিরার মাধ্যমে হৃদপিন্ড থেকে বের হয়ে শিরা-উপশিরার মাধ্যমে সমস্ত শরীরে বাহিত হয়ে পুনরায় হৃদপিন্ডে ফিওে আসে তাকে রক্ত সনংচালন প্রক্রিয়াা বলে। এই প্রক্রিয়ায় দেহে সর্বত্র খাদ্যসার, অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস, বিপাকীয় পদার্থ ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ স্থানান্তর করে থাকে। রক্তসংবহনরত হৃদপিন্ড ও বিবিধ রক্তনালী যেমন ধমনী, শিরা, কৌশিক নালী ইত্যাদি নিচে দেয়া হলো-

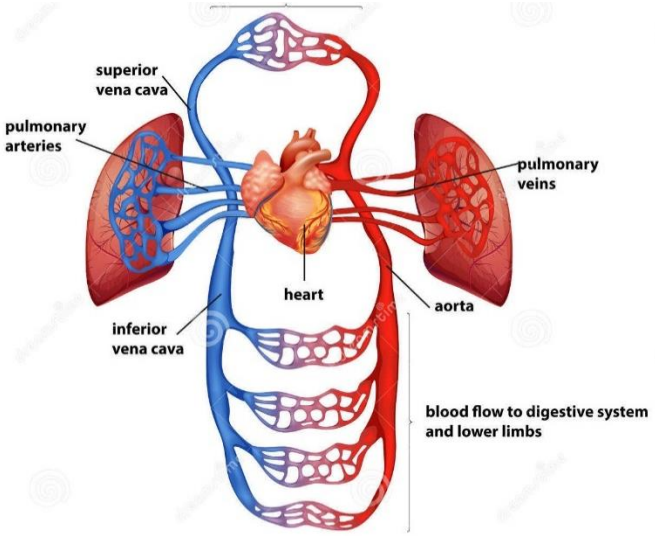

চিত্র ৫: মানবদেহের রক্তসংবহনতন্ত্র

রক্তের প্রয়োজনীয়তা :

ক) রক্তসংবহনতন্ত্রের মাধ্যমে রক্ত শরীরের বিভিন্ন কোষে অক্সিজেন সরবরাহ করে এবং শরীর থেকে ফুসফুসের মাধ্যমে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বের করে দেয়।

খ) স্বাভাবিক রক্ত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় ।

গ) শরীরের ভিতরে রক্ত জমাট বাঁধতে না দেয়া এবং কোথাও কেটে গেলে রক্ত জমাট বাঁধতে সহায়তা করা।

ঘ) শোষিত খাদ্যদ্রব্য, ভিটামিন, পানি ও অন্যান্য উপাদান কোষ বা কলাতে সরবরাহ করা।

ঙ) শরীরে পানি, তাপমাত্রা ও এসিডের ভারসাম্য রক্ষা করে থাকে এবং

চ) দেহের বিভিন্ন অংশের মাঝে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন কওে থাকে।

পাঠ ১.৩: ব্যবহারিক শারীরিকবিদ্যা

রক্তের কোষ গণনা, ইএসআর, রক্ত জমাট প্রক্রিয়া, ব্লাড গ্রুপ, ব্লাড প্রেশার

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা

১. শারীরিকবিদ্যা বিষয়ক সম্যক ধারণা লাভ ও তা ব্যাখ্যা করতে পারবে;

২. শারীরিকবিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজনিয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে;

৩. শারীরিকবিদ্যার বিভিন্ন তন্তের কার্যক্রম ও তাদের ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা লাভ ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন; এবং

৪. স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে শিক্ষার্থীর করণীয় কী তা বলতে পারবেন।

রক্তের কোষ গণনা

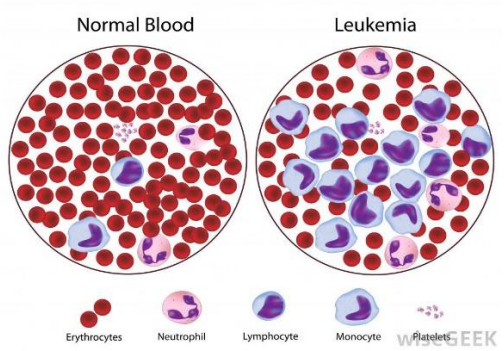

চিত্র ৬: রক্ত গনণার পদ্ধত্তি

ইএসআর

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা

১. শারীরিকবিদ্যা বিষয়ক সম্যক ধারণা লাভ ও তা ব্যাখ্যা করতে পারবে;

২. শারীরিকবিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজনিয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে;

৩. শারীরিকবিদ্যার বিভিন্ন তন্তের কার্যক্রম ও তাদের ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা লাভ ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন; এবং

৪. স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে শিক্ষার্থীর করণীয় কী তা বলতে পারবেন।

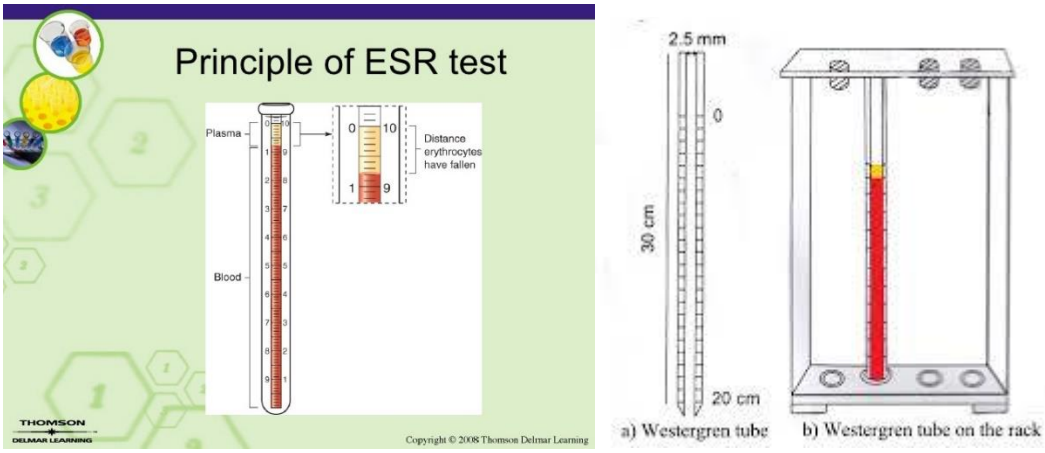

চিত্র ৭: রক্তের ইএসআর গনণার পদ্ধতি

রক্ত জমাট প্রক্রিয়া

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা

১. শারীরিকবিদ্যা বিষয়ক সম্যক ধারণা লাভ ও তা ব্যাখ্যা করতে পারবে;

২. শারীরিকবিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজনিয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে;

৩. শারীরিকবিদ্যার বিভিন্ন তন্তের কার্যক্রম ও তাদের ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা লাভ ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন; এবং

৪. স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে শিক্ষার্থীর করণীয় কী তা বলতে পারবেন।

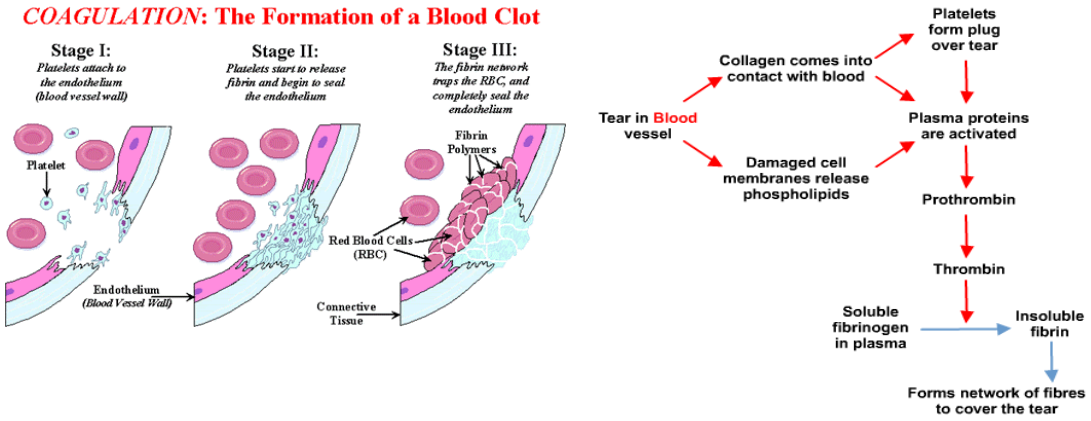

চিত্র ৮: রক্তর জমাট বাধার পদ্ধতি

ব্লাড গ্রুপিং

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা

১. শারীরিকবিদ্যা বিষয়ক সম্যক ধারণা লাভ ও তা ব্যাখ্যা করতে পারবে;

২. শারীরিকবিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজনিয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে;

৩. শারীরিকবিদ্যার বিভিন্ন তন্তের কার্যক্রম ও তাদের ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা লাভ ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন; এবং

৪. স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে শিক্ষার্থীর করণীয় কী তা বলতে পারবেন।

ব্লাড গ্রুপিং
রক্তের শ্রেণী.....
ল্যান্ডষ্টেইনার ..... সিস্টেমে ব্লাডগ্রুপ করার পদ্ধতি ১৯০১ সালে নির্ণয় করেন। এছাড়া... লুইস, ডাফি ইত্যাদি সিস্টেমেও রক্তের গ্রুপিং করা হয়েছে।
সকল মানুষের রক্ত এক রকম নহে। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পদ্ধতি ... রক্ত কে বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত করেছে। তবে ২টি পদ্ধতি জনপ্রিয়।
১। এ.বি. ও পদ্ধতি ..ঃ
এই পদ্ধতিতে সমস্ত মানুষের রক্তকে ৪টি গ্রুপে ভাগ করা হয়। এ , বি, ও, এবং এবি।
২। আর. এইচ. পজেটিভ, আর, এইচ নেগেটিভ । এ , বি, ও, এবং এবি সিস্টেমের কম্বিনেশনে মানবদেহের রক্তের গ্রুপ নির্ধারিত হয়।
১। ব্লাড গ্রুপ এ যার রক্তরসে এ এন্টিজেন আছে।
২। ব্লাড গ্রুপ বি যার রক্তেরসে বি এন্টিজেন আছে।
৩। . ব্লাড গ্রুপ এ এবি যার রক্তরসে এ ও বি উভয় এন্টিজেন আছে।
৪। (ও) যার রক্তরসে কোন এন্টিজেন নেই।
সিস্টেমে ২ ধরনের এন্টিজেন আছে।
পজিটিভ (+) অর্থ যার .. এন্টিজেন আছে।
নেগেটিভ (-) অর্থ যার .. এন্টিজেন নাই।
বাংলাদেশ প্রায় ৮৫ ভাগ লোকের এন্টিজেন আছে।
উদাহারণ ঃ ..+ রক্তের গ্রুপ, অর্থ যার রক্তে এ এবং .. এন্টিজেন আছে।
... (এবি নেগেটিভ) যার রক্তে এ বি এন্টিজেন আছে কিন্তু .. এন্টিজেন নাই।
.. (ও নেগেটিভ) যার রক্তে এ, বি, কিংবা .. এন্টিজেন কোনটিই নাই। তবে আমরা সাধারণত বলি .. (ও পজিটিভ), ... (এবি নেগেটিভ) ইত্যাদি । একজনের রক্ত গ্রুপ না মিললে অপরকে দেয়া নিষেধ। রক্ত যে কোন সুস্থ মানুষ। (যার বয়স ১৮ থেকে ৫০ এর মধ্যে) দান করতে পারেন প্রতি ৪ মাস অন্তর । এবি নেগেটিভ অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য শ্রেণীর রক্ত।
ক্রস ম্যাচিং .....
এক ব্যক্তির রক্ত অন্য ব্যক্তিকে দেবার সময় সময় রক্তের গ্রুপিং ... সিস্টেমে ছাড়াও ক্রস ম্যাচিং নামক পরীক্ষা করা হয় । যেমন-... গ্রুপের দাতা, .. গ্রুপের গ্রহীতাকে রক্ত দেবার পূর্বেও ক্রস ম্যাচিং পরীক্ষা কর হয়

কেননা ... ছাড়াও অন্য এন্টিজেনের বৈসাম্যের জন্য রক্ত দেবার পর রিএকশন হতে পারে। তাই রক্ত দেবার পূর্বে অবশ্যই .. করতে হবে।
সাধারনত .. গ্রুপ বিশিষ্ট গ্রহীতা শুধুমাত্র .. গ্রুপ বিশিষ্ট দাতাব নিকট থেকে রক্ত নিতে পারবে। তবে তারপর ক্রসম্যাচিং করতে হবে। রক্ত যে কোন সুস্থ লোকই (১৫-৫০ বৎসর) ৪ মাস অন্তর রক্ত দান করতে পারে।
রক্ত নেবার পর অনেক ক্ষেত্রে গ্রহীতার .. নিম্ন লিখিত জটিলতা/উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

- জ্বর, এলার্জী প্রতিক্রিয়া।
- রোগ সংক্রমন।
- রক্তকণিকা ভেঙ্গে যাওয়া।
- থ্রোমবোফ্লেবাইটিস ইত্যাদি।

রক্তের মাধ্যমে ম্যালেরিয়া, সিফিলিস, হেপাটাইটিস, এইডস ইত্যাদি রোগের সংক্রমন হতে পারে। তাই রক্ত নেবার পূর্বে দাতার ঐ সকল রোগ আছে কিনা পরীক্ষা করে নিতে হবে। যেমন-... .... ইত্যাদি।

নির্দেশনা ...
১) রোগীর প্রচুর রক্তক্ষরণ হলে, রক্ত দেবার জন্য গ্রুপিং প্রয়োজন।
২) গর্ভবতী মা।
৩) অপারেশন এর পূর্বে।
৪) রক্তদাতার গ্রুপ নির্ণয়ের জন্য।
৫) যদি পজিটিভ মায়ের নেগেটিভ বাচ্চা হয়।
রক্তদান বা ব্লাড ট্রান্সফিউশন..
(১)যে কোন সুস্থ ব্যক্তি যার বয়স ১৮ থেকে ৫৫ তারা রক্ত দান করতে পারে।
(২) গর্ভবতী ও স্তন্যপায়ী মায়েদের রক্ত দান নিষেধ।
(৩) রক্তদানের পূর্বে দাতার রক্তে সিফিলিস, এইডস, হেপটাইটিস বি, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি আছে দেখার জন্য .... টেষ্ট করতে হয়।
(৪) দাতার হিমোগ্লোবিন স্বাভাবিক থাকতে হবে।
(৫) দাতাও গ্রহীতার রক্ত একই গ্রুপের হতে হবে এবং ক্রস ম্যাচিং করতে হবে।
রক্তদান নির্দেশনা ....
(১) আঘাত জনিত কারনে প্রচুর রক্তক্ষরণ হলে যেমন-ফিমার, টিবিয়া বা পেলভিস ফ্রাকচার হলে।
(২) পেপটিক আলসার বা অন্য কারণে আভ্যন্তরিন রক্তক্ষরণ হলে।
(৩) হিমোফিলিয়া, লিউকো মিয়া বা অন্যান্য রক্তরোগে।
(৪) শরীরে অনেকাংশে পুড়ে... যাবার পরে।
(৫) দীর্ঘস্থায়ী রক্তপূণ্যতায় ভূগলে।
(৬) অপারেশন এ সময় বা বড় অপারেশন এর পরে।
ব্লাড ব্যাংকে অভিজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বধান ছাড়া রক্তদান ও রক্ত গ্রহণ নিষেধ।

ব্লাডট্রান্সফিউশনে জটিলতা

রক্তদানের সময় বা পরে গ্রহীতার বিভিন্ন শারিরীক অসুবিধা হতে পারে

(১)ক্রস ম্যাচিং না করে একই গ্রুপের রক্ত দিলে অনেক সময় গ্রহীতার রক্তচাপ কমে শকে চলে যেতে পারে এবং কিডনীর কার্যক্রম বন্ধ হতে পারে।

(২) জ্বর হতে পারে, শ্বাসকষ্ট ও কাঁপুনী হতে পারে।

(৩) দ্রুত রক্ত দিলে ফুসফুসে পানি জমতে পারে বা হার্ট ফেইলোর হতে পারে।

(৪) হাতে পায়ে খিচুনী হতে পারে।

(৫) রক্তনালীতে ইনফেকশন বা থ্রমবোফ্লবাইটিস হতে পারে।

(৬) উপযুক্ত পরীক্ষা না করে রক্ত দিলে এইডস, ম্যালেরিয়া, হেপাটাইটিস বি, সিফিলিস ইত্যাদি রোগ হতে পারে।

প্রত্যেক সুস্থ মানুষের উচিত প্রতি ৪মাস অন্তর রক্ত দেয়া। নিজের আত্নীয় স্বজনদের প্রয়োজন নিজেরা রক্ত দিবেন। কেনা রক্ত শরীরে নেয়া বিপদজনক। কারণ রক্ত বিক্রেতারা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত।

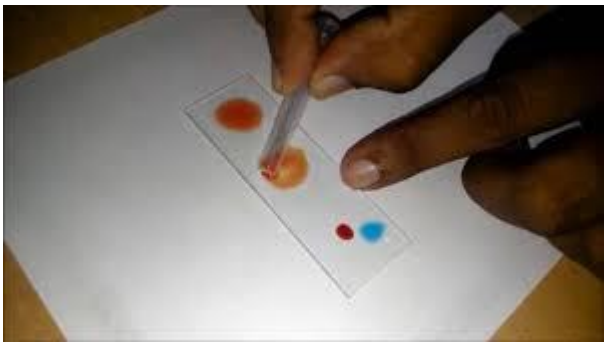

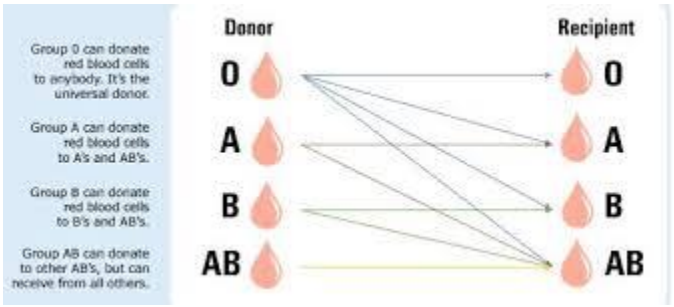

চিত্র ৯: রক্তের গ্রুপ নির্ণয়ের পদ্ধতি

ব্লাড প্রেশার

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা

১. ব্লাড প্রেশার বিষয়ক সম্যক ধারণা লাভ ও তা ব্যাখ্যা করতে পারবে;

২. ব্লাড প্রেশার শিক্ষার প্রয়োজনিয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে;

৩. ব্লাড প্রেশারের শেনী বিভাগসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারবে

৪. স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে শিক্ষার্থীর করণীয় কী তা বলতে পারবেন।

ব্লাড প্রেসার বা রক্ত চাপ...

রক্ত চাপ ৪ ধরনের

(১) সিসটোলিক ঃ হার্টএর সিসটোল বা সংকোচনের সময় সর্বোচ্চ যে চাল রক্তনালীর দেয়ালে রক্ত দেয় তাকে .... বলে । স্বাভাবিক ১০০-১৪০ মি.মি মার্কারী । এর দ্বারা বোঝা যায়ঃ

(ক) হার্ট এর সংকোচন ক্ষমতা।

(খ) হার্ট কি পরিমাণ কাজ করতে পারে ....

(গ) ধমনীর দেয়াল কতটুকু চাপ সহ্য করতে পারে।

(২) ডায়াসটোলিক প্রেসার হৃদপিন্ড প্রসারনের .... সময় সর্ব নিম্ন যে চাপ রক্ত ধমনীতে দেয় তাকে .... বলে ।

স্বাভাবিক মাত্রা ৬০-৯০ মি.মি. মার্কারী এর দ্বারা বোঝা যায় ঃ

(ক) হৃদপিন্ড যে স্থায়ী চাপের বিরুদ্ধে কাজ করে তাহা .....

(খ) এর দ্বারা পেরিফেরাল রেজিষ্টান্স বোঝা যায়।

(৩) পালস প্রেসার ঃ সিসটোলিক ও ডায়াসটোলিক প্রেসারের পার্থক্য।

মাত্রা-৩৫-৪৫ মি.মি. মার্কারী ।

(৪) মিন প্রেসার ঃ .... যে রক্ত চাপ হৃদপিন্ডের পুরো চক্র ... ব্যাপিয়া থাকে তাকে মীন প্রেসার বলে। মিন প্রেসার বাড়লে উচ্চ রক্তচাপ হবার সম্ভাবনা থাকে।

মাত্রা-৮৬-৯৬ মি.লি. মার্কারী ।

চিত্র ১০: ব্লাড প্রেশার মাপার পদ্ধতি

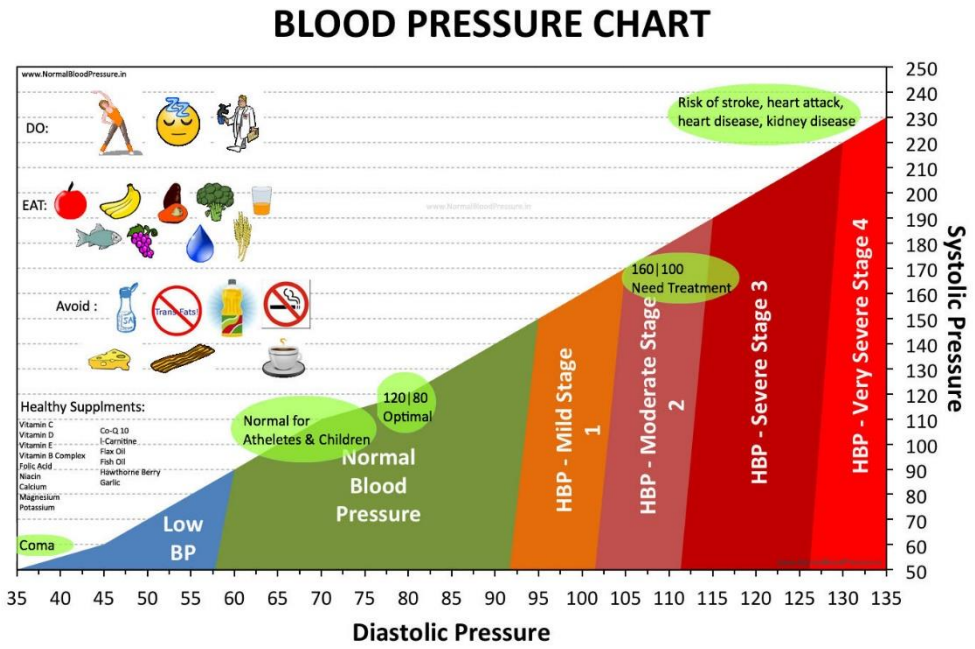

চিত্র ১০: ব্লাড প্রেশারের বিভিন্ন মাত্রার একটি গ্রাফ চিত্র

পালস....

পালস : হৃদপিন্ডের নিলয় সংকোচনের ফলে রক্তচাপের দরুন ধমনীর গাত্র প্রসারিত হয়ে ঢেউএর মতো শরীরে প্রত্যন্ত অংশে ছড়িয়ে পড়াকে পাল্‌স বলে।

পালস অনুভব করা হয় ধমনী গাত্রে।

উদ্দেশ্য ঃ পাল্‌স দেখে হৃদস্পন্দন এর গতি নির্ণয় করা যায়। আমরা সাধানত কবজির কাছে রেডিয়াল ধমনীতে পাল্‌স অনুভব করি। পালস অনুভবের সময় হাতের ৩ আঙুল ব্যবহার করা হয়।

তর্জনীর মাধ্যমে প্রেসার এডজাষ্ট করা হয়। মধ্যম আঙ্গুল দিয়ে পাল্‌স এর ঢেউ অর্থাৎ ধমনীগাত্র প্রসারন অনুভব করা হয়।

অঙ্গুরীয় আঙ্গুল দিয়ে কোলেটারেল (আলনার ধমনী থেকে আগত রক্ত) রক্ত সঞ্চালন বন্ধ করা হয়।

পালস এ কি দেখা হয় ঃ

(১) প্রতি মিনিটে হৃদস্পন্দনের গতি (পালস রেট)-যেমন ৭/মিনিট।

(২) রিদম-সমান সময় অন্তর ধমনী প্রসারিত হয়।

(৩) ভলিউম-রেডিয়াল ধমনী কতটুকু প্রসারিত হয় ।

(৪) ধমনীর অবস্থা।

(৫) ডি-লেঃ রেডিয়াল ধমনী ও ফিমোরাল ধমনীর পালস এর মধ্যে অসাম্যতা আছে কিনা ।

টেকিকার্ডিয়া কি?

হৃদস্পন্দন অর্থাৎ পাল্‌স প্রতিমিনিটে ১০০ এর বেশী হওয়াকে টেকিকার্ডিয়া বলে।

(১) ব্যায়াম করলে বা দৌড়ালে।

(২) ইমোশন।

(৩) ছোট বাচ্চাদের।

(৪) জ্বর হলে।

(৫) হাইপারথাইরয়েডিজম ইত্যাদি।

ব্রাডিকার্ডিয়া কি?

হৃদস্পন্দন অর্থাৎ পাল্‌স প্রতি মিনিটে ৬০এর কম হওয়াকে ব্রাডিকার্ডিয়া বলে। কারণঃ-

(১) দৌড়বিদদের ব্রাডিকার্ডিয়া হয়।

(২) হার্টব্লক।

(৩) অবষ্ট্রাকটিভ জন্ডিস।

(৪) মস্তিষ্কের চাপ বেড়ে গেলে।

ইউনিট ২: স্নায়ুতন্ত্র (Nervous system)

পাঠ ২.১: স্নায়ুতন্ত্র (Nervous system)

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা

১. স্নায়ুতন্ত্র (Nervous system) বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারবে;
২. স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের গঠন ও তার কাজ কি তা বলতে পারবে;
৩. স্নায়ুতন্ত্র সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারবে।
৪. স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে শিক্ষার্থীর করণীয় কী তা বলতে পারবেন।

যে তন্ত্রের সাহায্যে দেহ উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে এবং দেহের বিভিন্ন অঙ্গের পারস্পরিক সংযোগ সাধন করে শরীরের বিভিন্ন কাজ নিয়ন্ত্রণ করে তাকে স্নায়ুতন্ত্র বলে। স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান অংশগুলো হলোঃ

ক) মস্তিষ্ক (Brain)

খ) মেরুরজ্জু (Spinal cord)

গ) বহিঃস্নায়ুতন্ত্র (এখানে স্নায়ুকোষসমূহ শরীরে জালের মতো ছড়িয়ে থাকে)।

স্নায়ুতন্ত্রের একক হল নিউরন। অসংখ্য নিউরনের সমন্বয়ে আমাদের স্নায়ুতন্ত্র গঠিত। একটি নিউরন দুই ভাগে বিভক্ত, যথা- ১. মূল অংশ বা ডেন্ড্রাইড এবং ২. এক্সন । এছাড়াও অসংখ্য সংবেতনশীল রিসেপটরের একে অপরের সাথে সংযুক্ত থেকে মানবদেহের সকল কার্যক্রম নিয়ন্ত্রন করে থাকে।

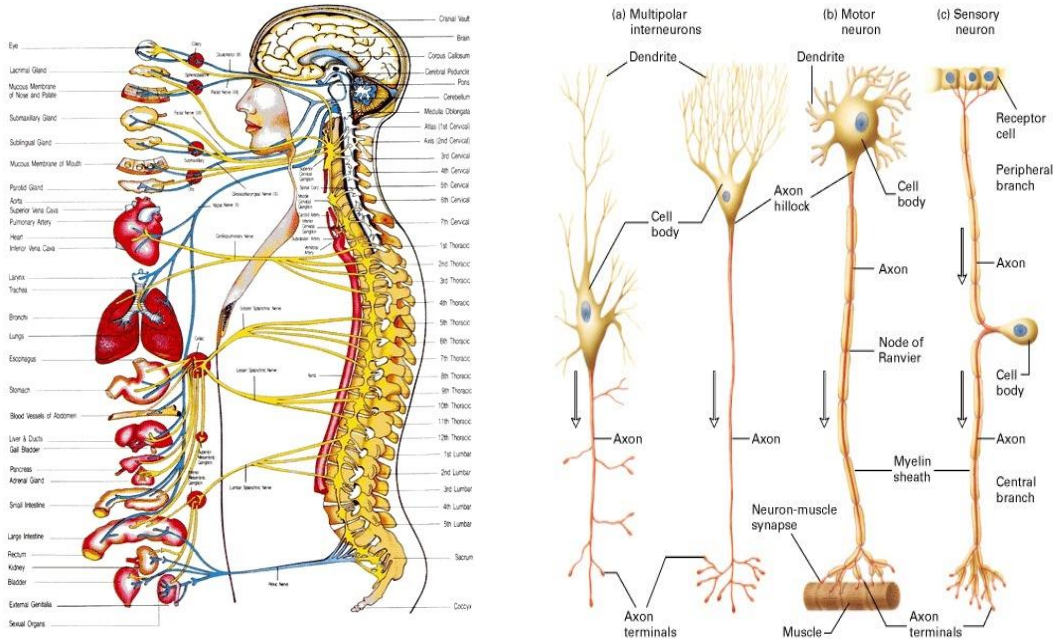

চিত্র ১১: স্নায়ুতন্ত্রের একক ও স্নায়ুতন্ত্রের একক বিস্তৃতি

প্রয়োজনীয়তা :

ক) মানুষের বুদ্ধিমত্তা, বিবেচনা, পরিকল্পনা বা ব্যবহার কার্যক্রম পরিচালনা।

খ) স্মৃতি সংরক্ষণ

গ) যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন

ঘ) দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ

ঙ) ভারসাম্য রক্ষ

ইউনিট ৩: পাঠ ৩.১: **পরিপাকতন্ত্র (Digestive system)**

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা

১. **পরিপাকতন্ত্র কি তা সম্পর্কে** সম্যক ধারণা লাভ ও তা ব্যাখ্যা করতে পারবে;

২. **পরিপাকতন্ত্রের** বিভিন্ন অংশের গঠন ও তার কাজ কি তা বলতে পারবে;

৩. **পরিপাকতন্ত্র সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারবে।**

পরিপাকতন্ত্র (Digestive system)

যে তন্ত্রের মাধমে জটিল খাদ্যদ্রব্য ভেঙ্গে দেহের গ্রহণোপযোগী হয়ে শোষিত হয়, তাকে পরিপাকতন্ত্র বলে। পরিপাকতন্ত্র নিম্নলিখিত অঙ্গসমূহের সমন্বয়ে গঠিতঃ

ক) মুখ গহ্বর (Mouth)
খ) জিহ্বা (Tongue)
গ) গলনালী (Esophagus)
ঘ) পাকস্থলী (Stomach)
ঙ) ক্ষুদ্রান্ত বৃহদান্ত্র (Small instestine)
চ) বৃহদান্ত (Large instestine)
ছ) কোলন বা মলাশয় (Rectum)
জ) মলদ্বার (Anus)
ঝ) যকৃত (Liver)
ঞ) অগ্নাশয় (Pancreas), ও
ট) পিত্তথলী (Gall bladder)

The Components of the Digestive System

চিত্র ১২: মানবদেহের পরিপাকতন্ত্র

চিত্র ১৩: মানবদেহের পরিপাকতন্ত্র ও বিভিন্ন অঙ্গের বিবরন

প্রয়োজনীয়তা :

ক) খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ ও হজম করা।

খ) বিভিন্ন ধরণের পরিপাক রস নিঃসরণ করা।

গ) হজমকৃত খাদ্য শোষণ করা।

ঘ) পানি, ভিটামিন ও খনিজপদার্থসমূহ শোষণ করা।

ঙ) শরীরের পানি এবং এসিড (Acid-base) এর ভারসাম্য রক্ষা করা

চ) রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা।

ইউনিট ৪: পাঠ ৪.১: **শ্বসনতন্ত্র (Respiratory system)**

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা

১. **শ্বসনতন্ত্র (Respiratory system) কি তা সম্পর্কে** সম্যক ধারণা লাভ ও তা ব্যাখ্যা করতে পারবে;

২. **শ্বসনতন্ত্রের** বিভিন্ন অংশের গঠন ও তার কাজ কি তা বলতে পারবে;

৩. **শ্বসনতন্ত্র সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারবে।**

শ্বসনতন্ত্র (Respiratory system)

যে তন্ত্রের মাধ্যমে শ্বাস-প্রশ্বাসের সাহায্যে শরীর বায়ু থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড বায়ুতে নিঃসৃত করে তাকে শ্বসনতন্ত্র বলা হয়। শ্বসনতন্ত্র নিম্নলিখিত অঙ্গসমূহ নিয়ে গঠিত ঃ

ক) নাকও নাসারন্ধ্র (Nose & Nostril)
খ) শ্বাসনালী (Respiratory tract)
গ) ট্রাকিয়া (Trachea)
ঘ) ফুসফুস (Lungs)
ঙ) ব্রঙ্কাস (Bronchus)
চ) এ্যালভিওলাই (Alveolie)
ছ) ডায়াফ্রাম (Diaphram

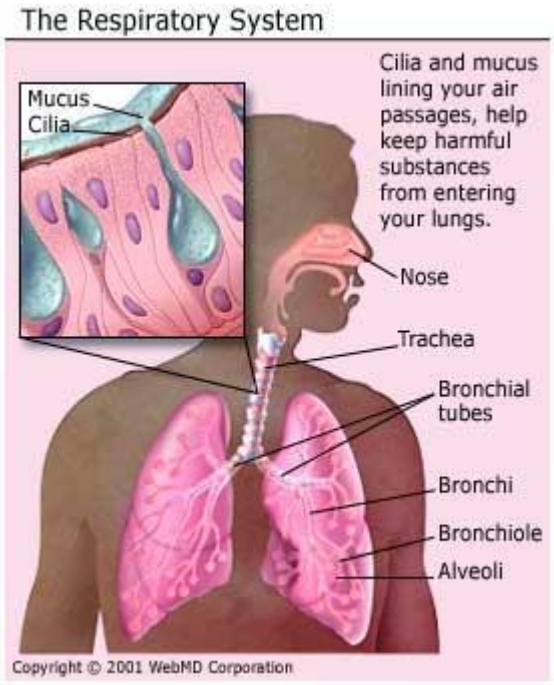

চিত্র ১৪: মানবদেহের শ্বসনতন্ত্র

শ্বসনতন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গের মাধ্যমে আমরা অক্সিজেন যুক্ত বায়ু গ্রহন করি এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড বায়ুতে নিঃসরন কওে থাকি, এই প্রক্রিয়াকে শ্বাস-প্রশ্বাস বা রেসপিরেশন বলা হয়। আমাদের বুকের হাড়ের ভিতর দুটি বড় বড় ফুসফুস আছে, মূলত এই দুটি ফুসফুসই শ্বাস-প্রশ্বাসের সাহায্যে শরীর বায়ু থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড বায়ুতে নিঃসৃত করে থাকে।

প্রয়োজনীয়তা :

ক) শ্বাস-প্রশ্বাসের সহায়তা করা।

খ) শ্বসনের ফলে দেহে অক্সিজেন সরবরাহ করা হয় এবং কার্বনডাই অক্সাইড শরীর থেকে বের করে দেয়া হয়।

গ) শরীরের পানি, তাপমাত্রা ও অম্ল-ক্ষার এর ভারসাম্য রক্ষা করা।

ঘ) শরীরের রক্ত সঞ্চলনে সাহায্য করা।

ইউনিট ৫: পাঠ ৫.১: রেচনতন্ত্র (Excretory system)

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা

১. **রেচনতন্ত্র (Excretory system) কি তা সম্পর্কে** সম্যক ধারণা লাভ ও তা ব্যাখ্যা করতে পারবে;

২. **রেচনতন্ত্রের** বিভিন্ন অংশের গঠন ও তার কাজ কি তা বলতে পারবে;

৩. **রেচনতন্ত্র সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারবে।**

রেচনতন্ত্র (Excretory system)

যে প্রক্রিয়ায় বিপাকের ফলে তৈরি ক্ষতিকর বর্জ্য পদার্থ দেহ থেকে বের হয়ে যায় তাকে রেচন বলা হয়। শরীরের যে সমস্ত অঙ্গ এই রেচন প্রক্রিয়া কাজ করে তাদেরকে একত্রে রেচনতন্ত্র বলা হয় । রেচনতন্ত্র মূলত নিম্নের অঙ্গসমূহ নিয়ে গঠিত-

ক) বৃক্ক (Kidney)

খ) মূত্রথলি (Urinary bladder)

গ) মূত্রনালী (Urethra)

ঘ) ত্বক (Skin)

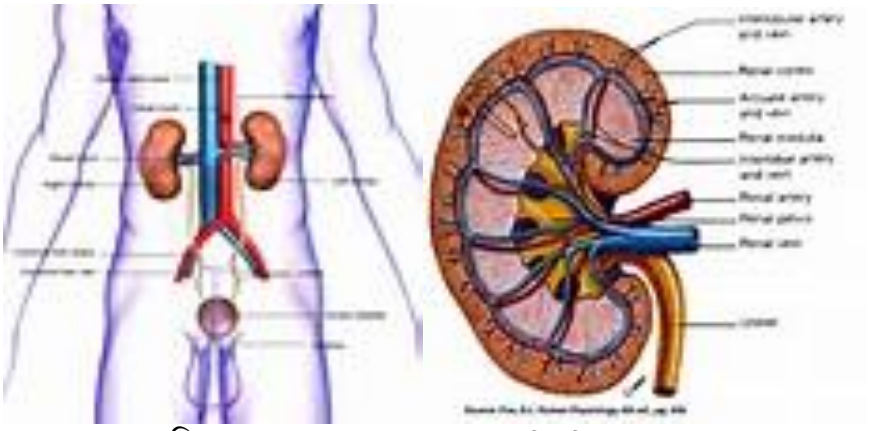

চিত্র ১৫: মানবদেহের রেচনতন্ত্র ও কিডনি'র ব্যবচ্ছেদ

প্রয়োজনীয়তা :

ক) বর্জ্য পদার্থ নিঃসরণ করা

খ) দেহের এসিড-বেইস ও মিনারেল এর ভারসাম্য রক্ষা করা

গ) রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা

ঘ) কোষের কার্যক্রমের জন্য সঠিক পরিবেশ রক্ষা করা

ঙ) রক্তের কোষ তৈরিতে সহায়তা করা

ইউনিট ৬: পাঠ ৬.১: **প্রজননতন্ত্র (Reproductive system)**

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা

1. **প্রজননতন্ত্র (Reproductive system) কি তা সম্পর্কে** সম্যক ধারণা লাভ ও তা ব্যাখ্যা করতে পারবে;

২. **প্রজননতন্ত্রের** বিভিন্ন অংশের গঠন ও তার কাজ কি তা বলতে পারবে;

৩. **প্রজননতন্ত্র সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারবে।**

প্রজননতন্ত্র (Reproductive system)

এ সকল অঙ্গ মানবদেহের প্রজননে সহায়তা করে তাদেরকে একত্রে প্রজননতন্ত্র বলা হয়। পুরুষ ও স্ত্রী প্রজননতন্ত্র নিম্নলিখিত অঙ্গসমূহের সমন্বয়ে গঠিত-

ক) পুরুষ প্রজননতন্ত্রঃ

I. টেসটিস বা শুক্রাশয় (Testis)
II. সেমিনাল ভেসিকল (Sesminel vesicle)
III. ক্ষেপণ নালী (Ejaculatory duct)
IV. ভাস ডেফারেন্স (Vas deference)
V. প্রস্টেট (Prostate)
VI. যৌনাঙ্গ (External genital)

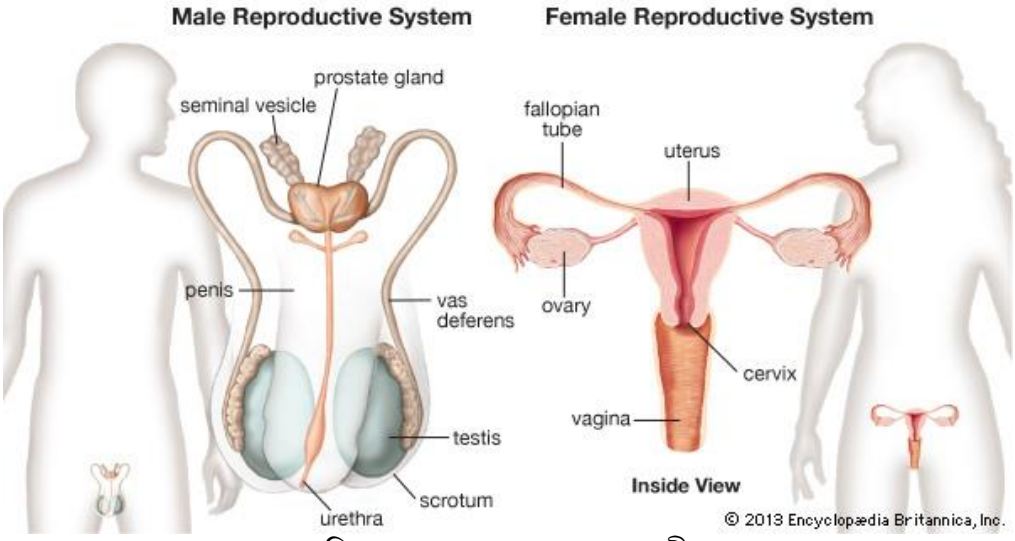

চিত্র ১৬: মানবদেহের পুরুষ ও স্ত্রী প্রজননতন্ত্র

খ) স্ত্রী প্রজননতন্ত্রঃ

I. ডিম্বাশয় (Ovary)
II. ফেলোপিয়ান নালী (Fallopian tube)
III. গার্ভিক্স (Cervex)
IV. এন্ডোমেট্রিয়াম (Endrometrium)
V. জরায়ু (Uterus)
VI. যৌনাঙ্গ (External genital)

প্রয়োজনীয়তা ঃ

ক) প্রজনন কার্যক্রম ও প্রজনন ক্ষমতা পরিচালনা
খ) বংশগতি রক্ষা করা
গ) প্রজনন কোষ তৈরি করা
ঘ) পুরুষ ও মহিলাদের সেক্স হরমোন তৈরি করা
ঙ) পুরুষ ও মহিলাদের যৌন বৈশিষ্ট্যসমূহের উন্নয়ন (Secondam sex characteristics)

ইউনিট ৭: পাঠ ৭.১: অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র (Endocrine system)

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা

১. অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র (Endocrine system) কি তা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ ও তা ব্যাখ্যা করতে পারবে;
২. অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের গঠন ও তার কাজ কি তা বলতে পারবে;
৩. অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারবে।

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র (Endocrine system)

যে সকল গ্রন্থি হতে হরমোন নিঃসৃত হয়, তাদেরকে অন্তঃরক্ষা গ্রন্থি বলা হয়। বিভিন্ন ধরণের অন্তঃরক্ষা গ্রন্থি মিলে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র গঠিত হয়। হরমোন হলো মানবদেহের বিশেষ ধরণের রাসায়নিক পদার্থ যা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিকোষ হতে নিঃসৃত হয়ে রক্তে প্রবেশ করে এবং জৈবিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিসমূহ নিম্নরূপ -

ক) পিনিয়াল গ্রন্থি (Pineal gland)
খ) পিটুইটারী গ্রন্থি (Pituary gland)
গ) থায়রয়েড গ্রন্থি (Thyroid gland)
ঘ) প্যারাথায়রয়েড গ্রন্থি (Parathyroid gland)
ঙ) এড্রিনাল গ্রন্থি (Adrenal gland)
চ) অগ্ন্যাশয় (Pancreas)
ছ) ডিম্বাশয় (Ovary)
জ) শুক্রাশয় (Testes)

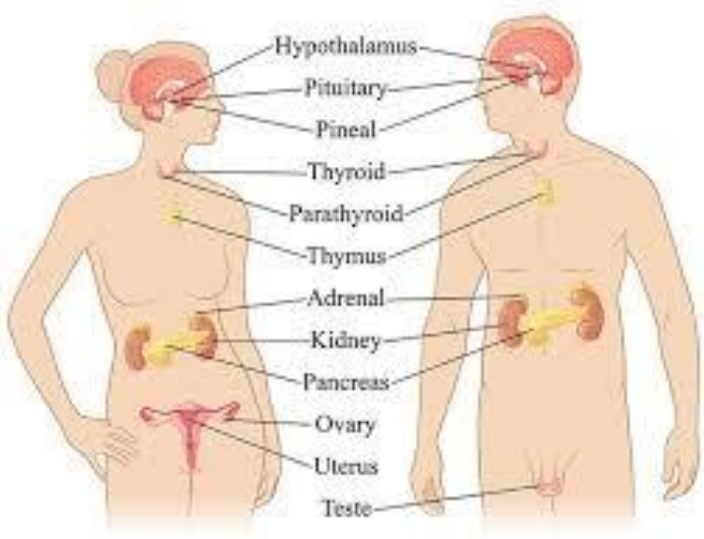

চিত্র ১৭: মানবদেহের পুরুষ ও স্ত্রী অন্তঃরক্ষা গ্রন্থি

প্রয়োজনীয়তা :

ক) দেহের বৃদ্ধি ও গঠনে সহায়তা করা।

খ) যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন করা।

গ) রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা।

ঘ) কোষের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করা।

ঙ) ভারসাম্য রক্ষা করা।

চ) বিপাক প্রক্রিয়া পরিচালনা।

ইউনিট ৮: পাঠ ৮.১: পেশী ও কংকালতন্ত্র (Musculo-skeletal system)

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা

১. **পেশী ও কংকালতন্ত্র (Musculo-skeletal system) কি তা সম্পর্কে** সম্যক ধারণা লাভ ও তা ব্যাখ্যা করতে পারবে;

২. **পেশী ও কংকালতন্ত্রের** বিভিন্ন অংশের গঠন ও তার কাজ কি তা বলতে পারবে;

৩. **পেশী ও কংকালতন্ত্র সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারবে।**

পেশী ও কংকালতন্ত্র (Musculo-skeletal system)

বিভিন্ন ধরনের পেশীকলার সমন্বয়ে যে তন্ত্র গঠিত হয় তাকে পেশীতন্ত্র বলে। পেশীতন্ত্র নিম্নলিখিত পেশীকলার সমন্বয়ে গঠিত

ক) ঐচ্ছিক পেশী (Skeletal muscle)

খ) অনৈচ্ছিক পেশী (Smoth muscle)

গ) হৃদপেশী (Cardiac muscle)

যে তন্ত্র দেহের কাঠামো, গঠন, আকৃতি প্রদান, বিভিন্ন অঙ্গকে বাহ্যিক আঘাত থেকে রক্ষা এবং দেহের চলাচলে সহায়তা করে তাকে কংকালতন্ত্র বলে। মানবদেহের কংকালতন্ত্র বিভিন্ন অস্থি ও তরুণাস্থি নিয়ে গঠিত। জন্মের সময় নবজাতকের শরীরে ৩০০রও বেশি হাড় থাকে যা পূর্ণাঙ্গ মানব দেহে সর্বমোট ২০৬ টি হাড়ে পরিণত হয়।

প্রয়োজনীয়তা :

ক) দেহের কাঠামো ধরে রাখা।
খ) চলাচলে সহায়তা করা।
গ) অঙ্গ-প্রতঙ্গের নড়াচড়া ও সঞ্চালনে সহায়তা করা
ঘ) দেহের অবকাঠামো ও গঠন বৃদ্ধি করা।
ঙ) শরীরের ভারবহন ও সংরক্ষণ করা।

ইউনিট ৯: মানবদেহের কোষ ও কলা (Cell and Tissue)

পাঠ ৯.১: মানবদেহের কোষ (Cell)

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা

১. মানবদেহের কোষ (Cell) কি তা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ ও তা ব্যাখ্যা করতে পারবে;

২. মানবদেহের কোষ বিভিন্ন অংশের গঠন ও তার কাজ কি তা বলতে পারবে;

৩. মানবদেহের কোষ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারবে।

মানবদেহের কোষ (Cell)

দেহ গঠনের এবং কার্যকারিতার একককে কোষ বলে। কোষ নিম্ন লিখিত অংশ নিয়ে গঠিত-

1. কোষ আবরণী (Cell membrane)
2. সাইটোপ্লাজম (Cytoplasm) এবং
3. নিউক্লিয়াস বা প্রাণকেন্দ্র (Nucleus)

১। কোষ আবরণী (Cell membrane)

এটি কোষের বহিঃস্থ আবরণ। এর মধ্যে ছোট ছোট ছিদ্র থাকে যার মধ্য দিয়ে খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য বস্তু যাতায়াত করতে পারে। এটি কোষকে রক্ষা করে ও কোষের আকৃতি প্রদান করে।

২। সাইটোপ্লাজম (Cytoplasm)

এটি কোষের মাঝের এক ধরনের জটিল ও ঘন তরল পদার্থ। এটি কোষ মাতৃকা (matrix) নামে পরিচিত । সাইটোপ্লাজমে কোষের বিভিন্ন অঙ্গাণুসমূহ (Organelles) বিদ্যমান । অঙ্গাণুসমূহের মধ্যে রয়েছে-

ক. মাইটোকন্ড্রিয়া (Mitochondria)

খ. গলজি বডি (Golgi body)

গ. সেন্ট্রোজোম (Centrosome)

ঘ. লাইসোজোম (Lysosome)

ঙ. রাইবোজোম (Ribosome)

চ. এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম (Endoplasmic reticulum) ইত্যাদি সাইটোপ্লাজমে কোষ বিভাজনসহ (Cell division) কোষের যাবতীয় জৈবিক কাজ সংঘটিত হয়।

৩। প্রাণকেন্দ্র (Nucleus)

এটি সাইটোপ্লাজমের মাঝে থাকে। প্রাণকেন্দ্রে মানবদেহের ক্রোমোজোম থাকে।

পাঠ ৯.২: কলা (Tissue)

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা

১. **কলা (Tissue)** বিষয়ক সম্যক ধারণা লাভ ও তা ব্যাখ্যা করতে পারবে;

২. **কলা (Tissue)**শিক্ষার প্রয়োজনিয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে;

৩. **কলার** বিভিন্ন কার্যক্রম ও তাদের ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা লাভ ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন; এবং

৪. স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে শিক্ষার্থীর করণীয় কী তা বলতে পারবেন।

একই ধরণের গঠন এবং একই ধরণের কাজ সম্পাদনকারী অনেকগুলো কোষকে একত্রে কলা বলা হয়। কলা চার প্রকার ঃ

১. আবরণী কলা (Epithelial tissuue) : এটি দেহের বাইরের ও ভিতরের আবরণ তৈরি করে।

২. সংযোজক কলা (Cennective tissue): এটি দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সাথে অথবা একই অঙ্গের বিভিন্ন অংশের সাথে সংযোগ স্থাপন করে।

৩. পেশী কলা (Muscle tissue): পেশীকলা সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালন, নাড়াচড়া ও চলাফেরাতে সাহায্য করে।

৪. স্নায়ুকলা (Nerve tissue) : স্নায়ুকলা স্নায়ুকোষের সমন্বয়ে গঠিত হয়। মস্তিষ্ক, স্নায়ুরজ্জু ও দেহের অন্যান্য স্নায়ুকোষ নিয়ে স্নায়ুতন্ত্র গঠিত।

ইউনিট ৩ ঃ কমিউনিটি মেডিসিন ও সংক্রমিত রোগ

সংক্রামক রোগ কি ও কিভাবে ছড়ায়
এবার আসুন, বোঝার চেষ্টা করি - পাবলিক হেল্‌থ কি?

একক বা ব্যক্তি-কেন্দ্রিক স্বাস্থ্য-সেবা যেমন 'চিকিৎসা' নামে পরিচিতি, তেমনি কোন জনগোষ্ঠী বা বৃহত্তর এলাকার লোকের সামগ্রিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে গৃহিত কার্যক্রমকে পাবলিক হেল্‌থ বা জনস্বাস্থ্য বলা হয়।

রোগের সাধারণ শ্রেনী বিভাগ দু'টি: সংক্রামক এবং অ-সংক্রামক। অসংক্রামক রোগ যেমন পেপটিক আলসার, ক্যান্সার কিংবা অ্যাজমা- সাধারণত এক বা দুজন ব্যক্তিকে আক্রান্ড় করে। এর চিকিৎসাও একক ভাবেই করা হয়। কিন্তু এমন অনেক রোগ আছে যা একসাথে বহুজনকে আক্রমন করে। সাধারণত এ সকল রোগ জীবানু বা বাহক দ্বারা ছড়ায়। এগুলোকে সংক্রামক রোগ বলে।

অসংক্রামক ব্যাধিও সংক্রামক ব্যাধিতে রূপান্ড়রিত হতে পারে, যেমন অ্যাজমা। যদি পরিবেশের মধ্যেই শ্বাস-কষ্ট বৃদ্ধির যথেষ্ট উপাদান বৃদ্ধি পায়, যেমন বায়ূ দূষন, তাহলে অ্যাজমা জনস্বাস্থ্য সমস্যায় রূপ নিতে পারে।
একটি রোগ যখন জনগোষ্ঠীর ১০০ জন লোকের মধ্যে গড়ে ১ জনকে আক্রান্ড় করে তাহলে রোগটিকে জনস্বাস্থ্য-সমস্যা বা 'পাবলিক হেল্‌থ-প্রোবে-ম' ধরা হয়। পাবলিক হেল্‌থ প্রোবে-ম একটি জনগুর"ত্বপূর্ন সমস্যা। উদাহরণ স্বরূপ এ. আর. আই, ডাইরিয়া বা সিজেল্‌স-এর নাম বলা যায়- যেগুলো দেশের চিহ্নিত জনস্বাস্থ্য সমস্যা।

জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে বিহেভিয়ার বা ব্যক্তির আচরন অতীব গুর"ত্বপূর্ন। আচরন নিয়ন্ত্রিত হয়ে সচেতনতার দ্বারা। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায়, সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধে, বিভিন্ন রোগ নির্মূলে এবং রোগাক্রান্ড় ব্যক্তির পুনর্বাসনে স্বাস্থ্য সচেতনতা বিরাট ভূমিকা রাখতে সক্ষম। ডায়রিয়া, ভিটামিন 'এ'র অভাবে সৃষ্ট রাত-কানা রোগ কিংবা মরনব্যাধি 'এইডস' প্রতিরোধে নলেজ-অ্যাটিচুড-প্র্যাকটিস এবং পারস্পরিক সহযোগিতা অত্যন্ড় কার্যকরী বলে প্রমানিত হয়েছে।

চিকনগানিয়া জ্বর

১৯৫২-৫৩ সালে পূর্ব আফ্রিকার দেশ তাঞ্জানিয়ায় প্রথমবারের মতো এ জ্বর সনাক্ত হয়। গত পঁয়ষট্টি বছরে আফ্রিকা থাকে এই জ্বর বিভিন্নভাবে এশিয়া, আমেরিকা, আফ্রিকা এবং আমেরিকার প্রায় ৬০ টি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ২০০৫-২০০৬ সালে এই জ্বর ভারতীয় উপমহাসাগরের বিভিন্ন দ্বীপে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পরে যাতে প্রায় তিন লাখ মানুষ আক্রান্ত হয় এবং ২৩৭ জন মানুষ মারা যায়। এ দ্বীপগুলোর মধ্যে ফ্রান্সের লা রিইউনিয়ন দ্বীপও ছিলো। একি সময়ে এটা ভারতের মূল ভূখণ্ডেও ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রায় ১৫ লাখ মানুষ আক্রান্ত হয়। ২০১৪ সালে ফ্রান্সের মারতিনিক দ্বীপে প্রায় এক লাখ চুয়াল্লিশ হাজার মানুষ (মোট জনসংখ্যার ৩৭ ভাগ) এই জ্বরে আক্রান্ত হয় এবং এর ফলে ৪৭ জন মারা যায়। বাংলাদেশে এ জ্বরের প্রথম সংক্রমণ ধরা পড়ে ২০০৮ সালে|

এডিস মশা (ছবিঃ ইন্টারনেট)

চিকনগানিয়া জ্বর ভাইরাস জনিত। মাকন্দেই (তাঞ্জানিয়ার একটা ভাষা) ভাষায় 'চিকনগানিয়া' অর্থ 'যা বাঁকা করে দেয়'। কঙ্গোতে এ জ্বরকে বলা হয় 'বুকা-বুকা' যার অর্থ 'ভেঙ্গে যাওয়া'। এরকম নামের কারণ হল এই জ্বর হলে শরীরের গিরায় গিরায় এতো ব্যথা হয় যে রোগীর নড়তে-চড়তে ভীষণ কষ্ট হয়। বাংলায় এটাকে অনেকে ল্যাংড়া জ্বর বলে ডেকে থাকেন।

ডেঙ্গির মত চিকনগানিয়া ভাইরাসের বাহক হল এডিস মশা। এডিসের দুটি প্রজাতি এর বাহকঃ

1. এডিস এজিপ্টি (Aedes aegypti) এবং
2. এডিস অ্যালবোপিক্টাস (Aedes albopictus) । সংক্রমিত মশার

কামড়ের মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায়। এর জীবনচক্র এরকমঃ মশা-মানুষ-মশা। মানবদেহে প্রবেশের পর চিকনগনিয়া ভাইরাস মশার কামড়ের স্থানে বংশবিস্তার করে এবং পরে ধীরে ধীরে রক্তের মাধ্যমে লিভার এবং অস্থিসন্ধিতে ছড়িয়ে পড়ে। সংক্রমণের পর লক্ষণ প্রকাশ পেতে সময় লাগে ২ থেকে ৪ দিন এবং এর পরে হঠাত করে কাঁপুনিসহ প্রচণ্ড জ্বর চলে আসে। জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় বাতের ব্যথার মতো জয়েন্টে জয়েন্টে ভয়ঙ্কর ব্যাথা। মাথা ব্যাথা ও আলোক সংবেদনশীলতাও থাকতে পারে। চামড়ার নিচে রক্তক্ষরণের ফলে লাল রঙের র‍্যাশও দেখা দিতে পারে। এজন্য অনেকে এটাকে ডেঙ্গি জ্বর মনে করে। জ্বর সারতে সময় লাগে সাধারণত এক থেকে দু সপ্তাহ, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যথা সারতে সময় বেশী লাগে। এটা মাস থেকে বছরেও গড়াতে পারে। ফ্রান্সের এক গবেষণায় দেখা গেছে প্রায় ৫০ভাগ রোগীর ক্ষেত্রে মাংশপেশী এবং

অস্থিসন্ধিতে ব্যাথা ৬ মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিলো। অনেক সময় কয়েক বছর এ ব্যাথা থেকে যায়। সংক্রমণের চুড়ান্ত পর্যায়ে প্রতি মিলিলিটার রক্তে ভারাইসের সংখ্যা প্রায় দশ কোটির মত হয়ে থাকে। তবে জ্বর সেরে গেলে রক্তে আর ভাইরাস থাকে না। চিকনগনিয়া জ্বর ডেঙ্গির মত ততোটা প্রাণঘাতী নয়। প্রতি এক হাজের এ জ্বরে ১ জন মারা যায়। বেশী ঝুঁকিতে থাকে শিশু, বৃদ্ধ, ও ডায়াবেটিক রোগীরা। এ জ্বরে একবার আক্রান্ত হলে আর দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

চিকনগানিয়া জ্বরের নির্দিষ্ট কোন চিকিৎসা নেই। কোন প্রতিষেধক বা টিকা এখনো বাজারে আসেনি। তবে বিজ্ঞানীরা ওষুধ এবং টিকা আবিষ্কারের জন্য কাজ করছেন। মূলত আফ্রিকা এবং এশিয়ার অনুন্নত দেশগুলোতে এর প্রকোপ বেশী হওয়ায় ২০০০৫-২০০৬ সালের আগে এটি নিয়ে তেমন গবেষণা হয়নি। ফ্রান্সের দ্বীপগুলোতে এ জ্বরের আক্রমণ হওয়ার পর মূলত এটা পশ্চিমা বিজ্ঞানীদের আগ্রহের কারণ হয় এবং এটা যেহেতু এখন আমেরিকা, ইতালিসহ অনেক উন্নত দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, তাই উন্নতমানের গবেষণা চলছে। সম্প্রতি দুটি টিকা গবেষণার শেষ পর্যায়ে আছে। খুব শীঘ্রই বাজারে আসার সম্ভাবনা আছে।

এ জ্বরের প্রধান চিকিৎসা হল বিশ্রাম। জ্বরের জন্য শুধুমাত্র প্যারাসিটামল খাওয়া যাবে। পূর্ণ বয়স্কদের দিনে ৫০০ মিলিগ্রামের আটটা ট্যাবলেট খাওয়া যেতে পারে। কিন্তু একবারে দুটার বেশী খাওয়া যাবেনা এবং এক ডোজ থেকে আরেক ডোজের ব্যবধান হতে হবে কমপক্ষে চার ঘন্টা। ডেঙ্গির সাথে কিছু লক্ষণের মিল থাকায়, এ জ্বর ডেঙ্গি না এটা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত এস পিরিন বা অন্য কোন গ্রুপের ব্যাথার ওষুধ খাওয়া বিপজ্জনক হতে পারে।

চিকনগানিয়া যেহেতু মশাবাহী রোগ, তাই এর প্রতিরোধের উপয়ায় হল মশার কামড় থেকে বাঁচা। এডিস মশা দিনে কামড়ায় (বিশেষ করে সকালে এবং পড়ন্ত বিকেলে) তাই দিনের বেলা মশা কামড় থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। হাত পা ঢাকা থাকে এমন জামা পরিধান করতে হবে। মশার বংশবিস্তার রোধে ব্যাবস্থা নিতে হবে। চিকনগানিয়ায় কেউ আক্রান্ত হলে তাকে মশার কামড় থেকে বাঁচা বাঞ্ছনীয়। কারণ, রোগের একিউট স্টেজে (৩-১০ দিন) রোগীর রক্তে প্রচুর ভাইরাস থাকে, এবং এর ফলে যে মশা রোগিকে কামড়াবে তা অন্যকে কামড়ালে রোগ ছড়িয়ে পড়বে। যৌনমিলনের মাধ্যমে বা সন্তান প্রসবের মাধ্যমে বা মায়ের দুধ খাওয়ানোর মাধ্যমে এ ভাইরাস ছড়ানোর কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। মায়েদের বুকের দুধ খাওয়ানোকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

আসুন আমরা ভয় না পেয়ে সচেতন হই, মশার কামড় থেকে বাঁচি, এডিস মশার বংশবিস্তার রোধ করি। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন।

ডেঙ্গু জ্বর

ডেঙ্গু জ্বর এক ধরনের ভাইরাসজনিত রোগ, যা এডিস জাতীয় মশা দ্বারা ছড়ায়। এই মশা আমাদের ঘরে ও আশপাশের পরিষ্কার পানিতে ডিম পাড়ে। সাধারণত এডিস মশা দিনের বেলায় কামড়ায়। বহু আগ থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ডেঙ্গু জ্বর আছে, তবে ট্রপিক্যাল দেশগুলোতে এর আধিক্য রয়েছে। বর্তমানে যেসব দেশে ডেঙ্গু জ্বর বৃদ্ধি পেয়েছে তার মধ্যে বাংলাদেশ, ভারত, মিয়ানমার, ও থাইল্যান্ড অন্যতম। ধারণা করা হয় যে, প্রতি বছর ৫ থেকে ১০ কোটি মানুষ ডেঙ্গু জ্বরে এবং প্রায় ৫ লাখ মানুষ ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভারে আক্রান্ড় হচ্ছে। বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে ডেঙ্গু জ্বরের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় ২০০০ সালে মার্চ-আগষ্ট মাসে। এ সময় আমাদের অজ্ঞতা ও অসাবধানতার জন্য তা ব্যাপক ভীতির সঞ্চার করে এবং বেশ কিছু মূল্যবান জীবন প্রদীপ নিভে যায়। পলিও, ম্যালেরিয়া ও টাইফয়েড জ্বরের চেয়ে ডেঙ্গু জ্বর কম মারাত্মক। ডেঙ্গু জ্বরে আতঙ্কগ্রস্থ না হয়ে ডাক্তারের নির্দেশমতো সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ বা ব্যবস্থা নিলে তাড়াতাড়ি সুস্থ হওয়া সম্ভব এবং মৃত্যুর সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। প্রচুর পরিমাণে পানীয় খাওয়া প্রাথমিক গুর"ত্বপূর্ণ চিকিৎসা। মনে রাখতে হবে সব জ্বরই ডেঙ্গু জ্বর নয় এবং ডেঙ্গু জ্বরে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োজন হয় না।

ডেঙ্গু ভাইরাস ঃ

এটি একটি RNA (Single strand) জাতীয় ভাইরাস। Flaviviridae family এবং Flavivirus genus - এর অন্ড়র্গত। এই ভাইরাসের ৪ ধরনের সেরোটাইপ রয়েছে (যেমন- DEN 1, 2, 3,4)। এক ধরনের সেরোটাইপ দ্বারা আক্রান্ড় হওয়ার পর যে অ্যান্টিবডি তৈরি হয় তা অন্য ধরনের সেরোটাইপ ডেঙ্গুর আক্রমণের বিরূদ্ধে কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে না। ফলে ডেঙ্গু জ্বর কোনো এক ব্যক্তির একাধিক বার হতে পারে, এমনকি পরবর্তী সময়ে তা মারাত্মক রূপে দেখা দিতে পারে। DEN-2 সেরোটাইপ বেশি মারাত্মক।

ডেঙ্গু ভাইরাসের বাহক ঃ

এত দিন আমরা মশা থেকে সাবধান থাকতাম ম্যালেরিয়া জ্বর থেকে রক্ষার জন্য। বর্তমানে এর সাথে যোগ হলো ডেঙ্গু জ্বর। অর্থ্যাৎ ডেঙ্গু জ্বর মশার মাধ্যমে ছড়ায়। এডিসজাতীয় মশার (মূলত Aedes aegypti ও Aedes albopictus) কামড় থেকে ডেঙ্গু ভাইরাস একজন থেকে আরেকজন বিস্ড়ার লাভ করে। এই মশা পরিষ্কার জমানো পানিতে (বাথর"মে, ফুলের টবে, টিনের কৌটায়, গ্যারেজ-টায়ারে, গাছের কোঠরে জমানো পানিতে) ডিম পাড়ে। বর্ষাকাল মশার ডিম পাড়া ও বাচ্চা ফোটার উপযোগী সময়। ফলে ডেঙ্গু জ্বরের প্রাদুর্ভাব বর্ষাকালের শেষের দিকে (August-December) ব্যাপকভাবে দেখা যায়।

রোগতত্ত্ব (Pathogenesis) ঃ

এডিস মশার মাধ্যমে মানবদেহে ডেঙ্গু ভাইরাস প্রবেশ করার পর কোথায় ভাইরাসের বৃদ্ধি ঘটে তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও ধারণা করা হয় যে, মনোনিউক্লিয়ার ফেগোসাইটিক (Mononuclear Phagocytic cell) কোষে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং অস্থিমজ্জার মেগাকেরিওসাইট কোষকেও আক্রমণ করে। ভাইরাস মনোনিউক্লিয়ার ফেগোসাইট কোষে প্রবেশ করার পর কমপি-মেন্ট ও কাইনিনকে কার্যকর (activate) করে এবং সূক্ষ্ম রক্তনালীর পারমিয়াবিলিটি (Permeability) বাড়িয়ে দেয়, ফলে সহজে বেশি পরিমাণে রক্তের জলীয় অংশ প-াজমা রক্তনালী থেকে বেরিয়ে যায় এবং রক্তের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। রক্তনালীর পারমিয়াবিলিটি বেড়ে গিয়ে রক্তের জলীয় অংশ কমে গিয়ে রক্তের ঘনত্ব বেড়ে যাওয়াই রোগের আশঙ্কাজনক পরিণতির মূল কারণ। এভাবে চলতে থাকলে এক সময় দেহের মস্ড়িষ্ক, কিডনিসহ বিভিন্ন অঙ্গে রক্ত চলাচল ও অক্সিজেন সরবরাহ কমে গিয়ে রোগী আস্ড়ে আস্ড়ে নিস্ড়েজ ও অজ্ঞান হয়ে যায় (শক সিন্ড্রোম)। ডেঙ্গু জ্বরে প্রাইমারি ইমিউন প্রতিক্রিয়া হয় আর ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভারে সেকেন্ডারি ইমিউন প্রতিক্রিয়া হয়। যার ফলে দ্বিতীয়বার যখন কোনো ব্যক্তি ডেঙ্গু ভাইরাসে আক্রান্ড় হন, তখন সেকেন্ডারি ইমিউন প্রতিক্রিয়ার ফলে ... হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। কেননা ডেঙ্গু

ডায়রিয়া ও প্রতিকার

ডায়রিয়া বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুর অন্যতম কারণ। প্রতি বছর প্রায় ২ লাখ ৬০ হাজার শিশু ডায়রিয়া জনিত কারণে মৃত্যু বরণ করেন। এ মৃত্যুর শতকরা ৮০ ভাগই ঘটছে ২ বছরের নীচের শিশুদের ক্ষেত্রে। শুধুমাত্র বাংলাদেশেই নয়, ডায়রিয়া অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশ সমূহেরও অন্যতম স্বাস্থ্য সমস্যা। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার গবেষণায় দেখা গেছে উন্নয়নশীল দেশসমূহে প্রতি বছর ডায়রিয়ায় আক্রান্ড় হয় ৩০০ কোটি শিশু। এদের মধ্যে ৫০ লাখ শিশু মৃত্যু বরণ করেছে ডায়রিয়ায়। মৃত্যুর প্রধান কারণ পানিস্বল্পতা, শরীর থেকে অত্যাধিক পরিমাণ পানি ও লবণ বের হয়ে যাওয়ার কারণে এ পানিস্বল্পতা দেখা দেয়। আমাদের দেশে ডায়রিয়ার আর একটি গুর"ত্ব প্রভাব হচ্ছে অপুষ্টি। অসংখ্য শিশু ডায়রিয়া জনিত কারণে অপুষ্টিতে ভোগে। অপুষ্টির কারণে শরীরের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা কমে যায় এভং শিশু নিউমোনিয়া সহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ড় হয়। এছাড়া ডায়রিয়ার পুনঃ আক্রান্ড় হওয়ার সম্ভাবনাও বেড়ে যায়।

ডায়রিয়া কি?

এককথায় পাতলা অথবা পানির ন্যায় পায়খানা হওয়াকে ডায়রিয়া বলে এবং ২৪ ঘন্টায় কমপক্ষে ৩ বার পাতলা পায়খানা হতে হবে।

এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ঘন ঘন পায়খানা হওয়ার চেয়েও পায়খানা কেমন হলো ডায়রিয়া নির্ধারণে সেটাই অধিক জর"রী। কারণ খাদ্যভাসের কারণেও পায়খানা বার বার হতে পারে। যেসকল বাচ্চারা শুধুমাত্র বুকের দুধ খায় তাদেরও বারবার পায়খানা হয়ে থাকে এবং পায়খানা পেষ্ঠের মতো নরমও হয়ে থাকে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে শিশুর মা-ই সঠিক তথ্য দিতে পারবেন যে তার বাচ্চার পায়খানা হঠাৎ করে অধিক পরিমাণ পাতলা হয়ে গিয়েছে কিনা অথবা বেশীবার হচ্ছে কিনা। ডায়রিয়াতে পায়খানায় পানির পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী থাকে।

সাধারণভাবে পায়খানা কোন পাত্রে রাখলে সে পাত্রের আকৃতি ধারণ করবে তখন আমরা তাকে ডায়রিয়া জনিত পাতলা পায়খানা হিসেবে ধরে নিতে পারি।

ডায়রিয়া কাদের বেশী হয়ঃ

৬ মাস থেকে ২ বছরের শিশুদের মধ্যে ডায়রিয়া বেশী দেখা যায় বিশেষ করে ৬ থেকে ১১ মাসের বাচ্চাদের, যারা মায়ের দুধের পাশাপাশি অন্যান্য খাবার খেতে শুর" করে এবং হামাগুড়ি দিথে শিখে এতে করে তারা এটা সেটা মুখে দিতে শুর" করে এবং প্রায় হামাগুড়ি দেওয়া নোংরা হাত মুখে দেয়। তবে ৬ মাসের কম বয়সের যেসব শিশু গুর"র দুধ বা গুড়োদুধে অভ্যস্ড় তাদের মধ্যেও ডায়রিয়ার প্রকোপ বেশী। সাধারণভাবে ৫ বছরের কম বয়স্ক শিশুদের মধ্যে ডায়রিয়া রোগে আক্রান্ডের হায় অধিক।

কারণঃ

ডায়রিয়ার মূল কারণ জীবানু। বিভিন্ন প্রকার জীবানুর মাধ্যমে ডায়রিয়া হতে পারে। এরমধ্যে আমাদের দেশে ভাইরাসের প্রার্দূভাবই সবচাইতে বেশী। বিশেষ করে রোটা ভাইরাস। ভাইরাস ছাড়াও ব্যাকটেরিয়া যেমন ই.কলাই. ভিবরিও কলেরা ইত্যাদি অথবা ফাঙ্গাস দ্বারাও ডায়রিয়া হতে পারে।

এক্ষেতে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে রোগজীবানু সমূহ সবসময়ই রোগসৃষ্টি করতে সক্ষম হয় না। কারণ জীবানুকে বাঁধা দেয়ার জন্যে রয়েছে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, যখন শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় তখনই রোগে আক্রান্ড় হওয়ায় সম্ভাবনা বেড়ে যায়। আমাদের দেশের মুষ্টিমেয় শিশু-ই অপুষ্ঠিই শিকার আর এ অপুষ্ঠি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। একারণেই শিশুরা এতো অধিক হারে ডায়রিয়ায় আক্রান্ড় হওয়ায় মূলকারণ। আই.সি.ডি.আর.বি-এর একটি ক্ষেন্দ্র মতলবে পরিচালিত সেরে উঠে সমীক্ষায় দেখা গেছে যে অপুষ্ঠি দূর করলে ডায়রিয়ায় আক্রান্ড় কাল সংক্ষিপ্ত হয় এভং শিশু তাড়াতাড়ি সেরে উঠে এবং ডায়রিয়ায় পরবর্তী জটিলতা অনেক কমে যায়।

অপুষ্ঠি ছাড়া কতগুলো রোগ আছে যা শরীরের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয় যেমন-হাম, নিউমোনিয়া, ম্যালেরিয়া।

এ প্রসঙ্গে উলে-খ করা প্রয়োজন যে সকল শিশু জন্মের প্রথম ৫ মাস শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ানো হয় তাদের ডায়রিয়ায় আক্রান্ড় হওয়ার সম্ভাবনা যারা বুকের দুধ ছাড়া অন্যান্য খাবার গ্রহণ করে তাদের তুলনায় কয়েকগুন কমে যায়। এছাড়া বোতলের দুধ খাওয়ানো, বাসি খাবার খাওয়া, পানি বিশুদ্ধ না করা এবং ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব ও কাঁচা পাঁয়খানা বা যত্রতত্র মল ত্যাগ করা ডায়রিয়ার অন্যতম কারণ।

কিভাবে ডায়রিয়া ছড়ায়ঃ

ডায়রিয়া ছড়ানোর প্রধান মাধ্যম হল মল থেকে মুখ। পায়খানা থেকে জীবানু বিভিন্ন মাধ্যমে বাহিত হয়ে পানি অথবা খাদ্যের সাথে মুখ হয়ে খাদ্যনালীতে প্রবেশ করে। খাদ্যবস্তু, পানীয়, অপরিষ্কার হাত, গ-াস, পে-ট, চামচ ইত্যাদির মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। অপরিচ্ছন্ন হাত এবং মাছির মাধ্যমে সহজেই জীবানু যুক্ত মল উপরোক্ত মাধ্যমগুলিতে বয়ে নিতে পারে।

ডায়রিয়াতে কি ঘটে?

শরীর থেকে পানি ও লবণ বা ইলেকট্রলাইট যেমন সোডিয়াম, পটাশিয়াম, বাইকার্বনেট ইত্যাদি বের হয়ে যায়। শরীরের এ সকল অত্যাবশ্যকীয় উপাদান পায়খানা অথবা বমির সাথে বের হয়ে গেল এবং শরীরের লবণ ও পানির চাহিদা যথাযতভাবে পূরণ না হলে শরীরে পানি স্বল্পতা দেখা দেয়।

বস্তুত এ লবণ এবং পানির অভাবে ডায়রিয়ায় আক্রান্ড় রোগীর শরীরে নানা উপসর্গ দেখা দেয় এবং এ সকল উপসর্গ দেখেই চিকিৎসকরা ডায়রিয়া রোগীর শারীরিক অবস্থার ন্ড়র নির্ধারণ করেন।

পানি স্বল্পতার বিভিন্ন স্বতঃ

ডায়রিয়া সম্পর্কে সঠিক ধারনা লাভের জন্য পানি স্বল্পতার উপসর্গ ও চিহ্নগুলো স্পষ্টভাবে জানা প্রয়োজন। মূলতঃ এই উপাসর্গ সমূহের ভিত্তিতেই পানিস্বল্পতাকে ৩টি ন্ড়রে ভাগ করা হয়েছে যার উপর ভিত্তি করেই নির্ধারিত হয়েছে ডায়রিয়ার চিকিৎসা পদ্ধতি।

প্রথমে সঠিকভাবে রোগের যাবতীয় তথ্য নিতে হবে রোগী নিজে অথবা শিশুদের ক্ষেত্রে মা-ই ভালো তথ্য নিতে পারবেন।
যে সকল প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে-

পায়খানা কেমন? তরল কিনা। তরল হলে, কতটা তরল?
পরিমাণে কতটা যায়?
কতদিন ধরে শুর“ হয়েছে?
দিনে ক'বার হচ্ছে?
ডায়রিয়ার আগে অন্য কোন অসুস্থতা ছিলো কিনা?
জ্বর খিচুনী আছে কিনা?
পায়খানায় রক্ত যায় কিনা?
ডায়রিয়া কালীন সময়ে সে কি কি খাবার এবং চিকিৎসা পেয়েছে।
প্রস্রাব হচ্ছে কিনা?

এখানে একটি কথা গুর“ত্বপূর্ণ। অনেকেরই ভুল ধারণা আছে যে ডায়রিয়াতে মলের সাথে মিউকাস বা আম যাবে। বস্তুত এর সাথে ডায়রিয়ার কোন যোগ সূত্র নেই। ডায়রিয়ায় পায়খানায় পানির উপস্থিতি বা তারল্যই অধিক গুর“ত্বপূর্ণ।

পানি স্বল্পতার প্রথম ন্ড়রঃ

ডায়রিয়ার একেবারে প্রাথমিক পর্যায় প্রাথমিক স্ড়র এখানে সত্যিকার অর্থে পানি স্বল্পতা থাকেনা। ডায়রিয়ায় আক্রান্ড় রোগী সজাগ, সুস্থ দেখাবে, চোখ স্বাভাবিক মুখ জিহ্বা ভেজা থাকে এবং রোগী পানির তৃষ্ণাও বোধ করে না। পেটের চামড়া টেনে ধরে ছেড়ে দিলে সাথে সাথেই তা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায়। এটি একটি গুর"ত্বপূর্ণ চিহ্ন বা উপসর্গ যা আমরা পরবর্তীতে দেখব।

চিকিৎসাঃ

অধিকাংশ ডায়রিয়ার রোগী এ স্ড়রের। এখানে যেহেতু পানি স্বল্পতা নেই তাই চিকিৎসার মূল্য লক্ষ্য পানি স্বল্পতা প্রতিরোধকরা। এ স্ড় রের রোগীকে ঘরে বসেই চিকিৎসা করা যায়। ঘরে চিকিৎসার তিনটি নীতি রয়েছে। যা হল-

১. বেশী বেশী তরল খাবার খেতে দিতে হবে।
২. বেশী বেশী খাবার দিতে হবে।
৩. অবস্থার উন্নতি না হলে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

শিশুদের বেলায়ঃ

শিশুকে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী তরল থাকার দিতে হবে, ভাতের মাড়/চিড়ার পানি/ডাবের পানি-শিশু যতটুকু খেতে পারবে ততটুকু দিতে হবে। এবং প্রয়োজন মত খাবার স্যালাইন খেতে দিতে হবে। শিশুর বয়স যদি ২ বছরের কম হয় হবে প্রতিবার পায়খানার পর ঙ্গ-১কাপ, ২-১০ বছরের হলে ১-২ কাপ ১০ বছরের উর্ধ্বে হলে সে যতটুকু খেতে চায় ততটুকু খাবার স্যালাইন দিতে হবে। শিশুকে চামচ দিয়ে অথবা চুমুক দিয়ে আস্ড়ে আস্ড়ে খাওয়াতে হভে। যদি বমি হয় তবে ৫-১০ মিনিট অপেক্ষা করে ২-৩ মিনিট পরপর ১ চামচ করে স্যালাইন খাওয়াতে হবে।

পুষ্ঠিহীনতা প্রতিরোধে শিশুকে প্রচুর খাবার দিতে হবে। বুকের দুধ বা বয়স অনুযায়ী শিশু যে খাবারে অভ্যস্ড় তা ঘন ঘন খাওয়াতে হবে। ভাত ভাল/ডিম মাছ মাংষ খিছুড়ী নরম করে রান্না করে-১/২ চামাচ তেল মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। প্রতি ৩ ঘন্টা অন্ড়র দিকে কমপক্ষে ৬ বার খাবার দিতে হবে। ছোট শিশুদের আরো বেশী। ডায়রিয়া বন্ধ হওয়ার পর দুই সপ্তাহ পর্যন্ড় শিশুকে দিনে একবার অতিরিক্ত খাবার দিতে হবে যাতে সে পুষ্ঠিহীনতায় আক্রান্ড় না হয়।

পানি স্বল্পতারঃ
দ্বিতীয় স্ড়রঃ

এ স্ড়রে এসে ডায়রিয়ায় আক্রান্ড় রোগী বেশী অস্থির, খিটখিটে হয়ে যায় চোখ বসে যায়, কাদলে চোখ দিয়ে পানি বের হয়ে না। মুখ জিহ্বা শুকিয়ে যায়। সে তৃষ্ণার্ত থাকে এবং পানি দিলে আগ্রহ ভরে পানি পান করে। পেটের চামড়া ধরে টেনে ছেড়ে দিলে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায়। এক্ষেত্রে আমরা সিদ্ধান্ড় নিতে পারি যে তার কিছু পানিস্বল্পতা অথবা ংড়সব ফবযুফৎধঃরড়হ আছে।

চিকিৎসাঃ

এ স্ড়রে শিশুকে খাবার স্যালাইন দিতে হবে। রোগীর কতটুকু পরিমাণ খাবার স্যালাইন দরকার তা নির্ধারণে রোগীর ওজন কেজিতে মেপে যত কেজি হবে তাকে ৭৫ দিয়ে গুণ করলে যা হবে তত মি.লি. খাবার স্যালাইন খাওয়াতে হবে। তবে যদি সে আরো বেশী খেতে চায় তবে তাই দিতে হবে। এর পাশাপাশি বুকের দুধ ও স্বাভাবিক খাবার ঘন ঘন খাওয়াতে হবে এছাড়া প্রতি ১ ঘন্টা অন্ড়র রোগীর পানি স্বল্পতার স্ড়র নতুন করে নির্ধারণ করতে হবে। এতে যদি রোগীর অবস্থা উন্নতি হয় এবং পানি স্বল্পতা কেটে যায় তবে প্রথম স্ড়রের চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে আর যদি অবস্থার আরো অবনতি হতে থাকে এভং পরবর্তী স্ড়রের চলে যায় তবে চরম পানি শূন্যতার চিকিৎসা দিতে হবে।

তৃতীয় স্ড়রঃ

এক্ষেত্রে রোগী আসন্ন হতে নেতিয়ে পরে। ঘুম ঘুম ভাব থাকে। অজ্ঞান ও হয়ে যেতে পারে। চোখ বসে যায়। চোখে পানি থাকে না। মুখ ও জিহ্বা খুব শুকনো থাকে। পেটের চামড়া টান দিয়ে ছেড়ে দিলে অত্যন্ড় ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায়।

এ অবস্থাকে আমরা চরম পানি শূন্যতা বলি।

চিকিৎসাঃ

এ ন্ড়রে রোগীকে দ্রুত কলেরা স্যালাইন দিতে হবে। সুতরাং যথাশীঘ্র চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে অথবা হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে এবং এ প্রন্ড়তির সময়টাকে যদি শিশু খেতে পারে তবে তাকে খাওয়ার স্যালাইন খেতে দিতে হবে।

ডায়রিয়ার প্রভাবঃ

ডায়রিয়া অপুষ্ঠির অন্যতম কারণ। অপুষ্ঠিতে আক্রান্ড় শিশুদের রোগ প্রতিরোধ শক্তি কমে যাওয়ায় বার বার ডায়রিয়া আক্রান্ড় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং এক্ষেত্রে ডায়রিয়া মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে।

ঔষধঃ

প্রায় সব ক্ষেত্রেই ডায়রিয়া চিকিৎসা শুধুমাত্র স্যালাইন। ডায়রিয়ার জন্য দায়ী জীবানুসমূহের অধিকাংশের বিরুদ্ধে কোন কার্যকরী ঔষধ নেই। বরং এন্টিবায়োটিক, বিভিন্ন ঔষধের ব্যবহারে অনেক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ করে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া অনেক সময়ই ডায়রিয়ায় বমি বা পায়খানা বন্ধ অথবা পেট ব্যাথা কমাবার ঔষধ খাওয়ানো হয়ে থাকে এসবের ব্যবহারে পেট ফুটে যেতে পারে। রোগী ঝিমিয়ে পড়তে এমনকি শিশু রোগীর তা মৃত্যুরও কারণ হতে পারে।

কিছু নির্বাচিত ক্ষেত্রে যদি মলে রক্ত থাকে অথবা রোগীর জ্বর থাকে তাহলে ঔষধের প্রয়োজন হয় সুতরাং এসব ক্ষেত্রে দ্রুত চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ। তবে তখনও মনে রাখতে হবে যে স্যালাইনই ডায়রিয়ার প্রধান ঔষধ।

প্রশ্নঃ ডায়ারিয়ার চিকিৎসা কি শুধু হাসপাতালেই সম্ভব?

উত্তরঃ না-ঠিক তা নয়। রোগী যদি ডায়রিয়ার প্রথমন্ড়রে থাকে অর্থাৎ যতি তার শরীরে পানি স্বল্পতা না থাকে তবে ঘরে বসেই ডায়রিয়ার চিকিৎসা করা যাবে এবং এ ন্ড়রে চিকিৎসা ব্যবস্থা আগেই উলে-খ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে যেহেতু ঘরে বসে চিকিৎসা ব্যবস্থা নির্ভর করছে মূলত মায়ের উপর এবং আমাদের অধিকাংশ জনগোষ্ঠি অশিক্ষিত অথবা স্বল্প শিক্ষিত তাই মাকে এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট উপায়ে বলে দিতে হতে যেমন–

১. ডায়রিয়া চিকিৎসায় ঔষধের ভূমিকা নগন্য কারণ প্রায় সবাই ঔষধ চাবে।
২. অনেকের ধারনা আছে স্বাভাবিক খাবার/বুকের দুধে ডায়রিয়অ বাড়ে তাদের বলতে হবে যে শিশুকে সুস্থ্য, সজীব রাখতে অবশ্যই স্বাভাবিক খাবার বেশী বেশী করে খাওতে হবে।
৩. এ ছাড়া মাকে খাবার স্যালাইন তৈরী করার পদ্ধতি ও খাওয়ানোর নিয়ম ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে।

প্রশ্নঃ তা হলে কখন হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে?

যদি ঘন ঘন পানির মত পাতলা পায়খানা বা বমি হতে থাকে।
যদি ৩ দিনের মধ্যেও রোগীর অবস্থার উন্নতি না হয়।
যদি খাওয়ায় অনিহা দেখা দেয় অথবা বন্ধ করে দেয়।
যদি প্রচন্ড় পানি পিপাসা থাকে।

যদি জ্বর অথবা মলে রক্ত দেখা দিলে ও দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারে।

রোগীর প্রস্রাব বন্ধ হয়ে গেল। এটি ডায়রিয়া রোগের মারাত্মক জটিলতা। যদি ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রশ্রাব না হয় তবে রোগীকে নিকটবর্তী চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে।

প্যাকেট স্যালাইন তৈরীর পদ্ধতিঃ

প্রথমে ভালোভাবে সাবান ও পরিষ্কার পানি দিয়ে হাত ধুয়ে নিতে হবে এরপর যে পাত্রে স্যালাইন তৈরী করা হবে তা পরিষ্কার পানি দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। এবার পাত্রে এক প্যাকেটের সবটুকু স্যালাইন ঢেলে দিয়ে এতে আধা লিটার পানি যোগ করে পরিষ্কার চামচ দিয়ে নাড়িয়ে পুরোটা স্যালাইন গুলি নিতে হবে। স্যালাইন তৈরীর আগে প্যাকেটের গায়ে স্যালাইনের মেয়াদকাল দেখে নেয়া ভালো এছাড়া শিশুকে খাওয়ানোর পূর্বে নিজেও একবার চোখে নিতে পারেন। সঠিকভাবে তৈরী স্যালাইনে সাধারণতঃ চোখের পানির ন্যায় নোনতা স্বাদের হয়ে থাকে।

যদি হাতের কাছে বা কাছাকাছি স্যালাইন পাওয়া না যায় অথবা সংগ্রহে বিলম্ব হয়ে তবে পূর্বে উলে-খিত সকল প্রস্তুতি লবণ ও ১ মুঠো গুড় বা চিনি আধাসের পানিতে তলানি বিহীনভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে তৈরী সরবত বেশী লবণাক্ত হওয়া উচিত নয়। যদি চোখের পানির চেয়ে বেশী লবণাক্ত হয় তা ফেলে নতুনভাবে স্যালাইন তৈরি করতে হবে।

এখানে উলে-খ্য যে প্যাকেট থেকে তৈরী করা স্যালাইন ১২ ঘন্টা ও গুড়/চিনি দিয়ে তৈরী স্যালাইন ৬ ঘন্টা রাখা যায়। এ সময় উত্তীর্ণ হলে তা ফেলে দিয়ে নতুন স্যালাইন তৈরী করতে হবে।

ডায়রিয়া প্রতিরোধঃ

আমরা জানি প্রতিরোধ প্রতিকারের চেয়ে উত্তম। একটু সচেতন হলেই আমরা ডায়রিয়া প্রতিরোধ করতে পারি এবং সাশ্রয় করতে পারি, অর্থ, শ্রম এমনকি মহামূল্যবান জীবন। ডায়রিয়া প্রতিরোধ করার উপায় সমূহঃ-

১. ডায়রিয়া একটি পানি বাহিত রোগ, এজন্য ডায়রিয়া আমাদেরকে প্রথমতঃ বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করতে হবে। সাধারণত টিউব ওয়েলের পানি বা ফুটানো পানি ডায়রিয়ার জন্যে নিরাপদ। পরিষ্কার পাত্রে পানি এবং সংগ্রহ করতে হবে। পানির পাত্র ঢেকে রাখতে হবে।

২. হাত ধোয়া এবং পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করাঃ

ডায়রিয়ার জীবানু সবচাইতে বেশী ছড়ায় হাতের মাধ্যমে, দুষিত মল থেকে জীবানু হাতের মাধ্যম ছড়ায়। তাই সাবান ও যথেষ্ট পরিমাণ পরিষ্কার পানি দ্বারা পরিবারের সবাইকে ভালো ভাবে হাত ধৌত করেতে হবে-

বিশেষ করে- খাবার আগে ও পরে, শিশুকে খাওয়ানোর আগে, পায়খানা করার পরে, রান্না করার আগে এবং খাবার পরিবেশনের আগে।

৩. স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার করতে হবে। পায়খানায় যেন মাছি ঢুকতে না পারে। বাচ্চাদের পায়খানা দ্রুত পরিষ্কার করতে আগে।

৪. জন্মের প্রথম ৫ মাস শিশু শুধুমাত্র বুকের দুধ খাবে এসময়ে তার পুষ্ঠির জন্যে বুকের দুধই যথেষ্ট। এমনকি পানির ও প্রয়োজনেই। কারণ এ পানির মাধ্যমে ডায়রিয়ার জীবানু প্রবেশ করতে পারে। ৫ মাস পর বুকের দুধের পাশাপাশি পুষ্ঠি চাহিদা মেটাতে অন্যান্য খাবার দিতে হবে। শিশুর খাবার তৈরীতে মাকে সর্তকতা অবলম্ভন করতে হবে। ভাল করে হাত দুয়ে তরল খাবার তৈরী করতে হবে। পরিষ্কার স্থানে, পরিষ্কার পাত্রে খাদ্যবস্তু যথেষ্ট সময়ে ধরে রান্না করতে বা ফুটাতে হবে। খাবার ঠিক পূর্বেই রান্না করা উত্তম। যদি খেতে বিলম্ব হয় তবে খাবার ঢেকে রাখতে হবে। যদি রান্না করার পর ২ ঘন্টা অতিক্রান্ড় হয়ে তবে আবার তা ভাল করে গরম করে তারপর খাওতে হবে।

৫. শিশুর বয়স নয় মাস পূর্ণ হলেই হামের টিকা নিতে হবে কারণ হাম শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় এবং শিশু সহজেই ডায়রিয়া ও অন্যান্য রোগের আক্রান্ড় হয়।

৬. বোতলের দুধ খাওয়ানো যাবে না, বোতলে সব সময় পরিষ্কার রাখা কঠিন এবং বোতলে জীবানু জন্মানোর সুযোগ পায়। এজন্যে বোতলে দুধ খাওয়ালে ডায়রিয়ায় আক্রান্ড় হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

বন্যায়করনীয়ঃ

নিরাপদ খাবার পানি, নিরাপদ খাবার ও স্বাস্থ্য সম্মত পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারলে বন্যা ও পরবর্তী যে কোন মহামারীর প্রদুর্ভার প্রতিরোধও নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

১. যত কষ্টই হোক দূষিত ও বাসি খাবার খাবেন না। খাবার ঢেকে রাখবেন। বাসি খাবার যদি একান্ড়ই খেতে হয় তবে অবশ্যই তা পুরোপুরি গরম করে খাবেন। খাবের আগে অবশ্যই বিশুদ্ধ পানি দ্বারা হাত ধুয়ে নেবেন। বিছানাপত্র রোদে ভালো ভাবে শুকানো।
২. খাবার রান্না করতে না পারলে- চিড়া, গুড়, মুড়ি, বিস্কুট খাওয়া নিরাপদ।
৩. পানি বিশুদ্ধ করার পদ্ধতিসমূহঃ
পানি ফুটাতে শুর" করলে আন্ড়ত ১০-১৫ মিঃ ধরে ফুটাবেন।
বৃষ্টির পানি পরিষ্কার পাত্রে রেখে ২ দিন পর্যন্ড় ব্যবহার করা যায়। বৃষ্টির পানি প্রথম ৫ মিঃ পর সংগ্রহ করতে হবে।
পানি বিশুদ্ধকরণ টেবিলেট দ্বারা পানি বিশুদ্ধ করা যায়। অন্ড়ত পক্ষে ২ ঘন্টা রাখার পর পানি পান বা অন্য কাজে ব্যবহার করা যাবে।

২৫ সের পানিতে ১.৪ চা চামচ বিলিইচং পাউডার মিশিয়ে ৩০ মিনিট রাখার পর পানি ব্যবহার করা যায়। সময় বি-চিং পাউডারের পুরোপুরি --------- জমার আগেই পানি ব্যবহার করতে হবে।

ফিটকিরি গুড়া করে পানিতে মিশিয়ে অন্ড়তঃ ২ ঘন্টা রেখে তার পর তা ব্যবহার করার যেতে পারে। ২ চা চামচ কি ----------।

পানিতে বা খোলা যায়গায় মলমূত্র ত্যাগ করবেন না। নতুবা বসতবাড়ি থেকে দূরে মাটিতে গর্ত করে মলত্যাগ করে ভালোভাবে মাটি চাপ দেবেন।

বন্যায় প্রথমেই অসুস্থতার শিকার হয় শিশু মহিলা ও দূর্বল স্বাস্থ্যের মানুষ তাদের প্রতি যত্ন নিন।